এই আমার দেশ



গাভা, বরিশাল পঞ্চরত্ন মন্দির
বর্তমানে এখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে



লক্ষ্মণকাঠি
শ্রীবিষ্ণু মন্দির
সংস্কারের পরে



নেত্রকোনা নয়নযোগী আশ্রম



উলপুর গোপালগঞ্জ (ফরিদপুর)
পুরানো বাড়ি - ১৮০০ সাল



ঢাকার রাস্তার দৃশ্য



গান্ধী আশ্রম, নোয়াখালি

ডঃ সব্যসাচী ঘোষ দস্তিদার

এই আমার দেশ

ডঃ সব্যসাচী ঘোষদস্তিদার

পরিবেশক

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০৭৩

এই আমার দেশ
AI AAMAR DESH (THIS IS MY HOME)
by Sabyasachi Ghosh Dostidar

প্রকাশিকা ঃ মিলিতা

প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, কলিকাতা পুস্তকমেলা '৯৮
Jan, "98, Calcutta Book Fair
দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট, ২০১২

মুদ্রণ ঃ
ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১এ, গড়পার রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

Laser Type Setter :
জয়দেব দাস
জেএমএস এন্টারপ্রাইজেস্
১৫সি, ভুবন সরকার লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৭
মো ঃ ৯৮৩১৬৭২৪৯৮

প্রচ্ছদ ঃ মদন সরকার
Cover : Madan Sarkar

দাম ঃ ৫০ টাকা
৭ ডলার (ইউ. এস. এ)
US $7

কয়েকটা কথা

এই বই এর অধিকাংশ লেখাই ১৯৯২ থেকে ১৯৯৭-এর মধ্যে বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকা, পূজাসংখ্যা অথবা বিশেষ সাময়িকীতে ছাপা হয়। এর মধ্যে কয়েকটা লেখা এক বা একাধিক জায়গায় পুনঃমুদ্রির্ত হয়েছে। যেমন "নিভারাণীর স্বর্গবাস" নিউ ইয়র্কের এক পূজা সংখ্যা সহ কলকাতা ও ঢাকায় পুনঃমুদ্রিত হয়, এবং "যেখানে দেবদেবীরা বাস করেন" আমেরিকা ছাড়াও কলকাতা, ঢাকা ও চট্টগ্রামে ছাপা হয়। আমার দেশ আমেরিকা, পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশ। এই তিন দেশের অভিজ্ঞতার বিষয় নিয়ে লেখা "এ আমার দেশ"। আমার বা আমাদের মতো মানুষের "দেশ" কোথায় এ নিয়ে দেখেছি কিছু মানুষের চিন্তা। আমার দেশ কি আমেরিকা? অবশ্যই, এবং এটা যদি না মনে করি তো এদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকতে হবে, এ কথা বললে দেখেছি অনেক পশ্চিমবংগীয় এবং বাংলাদেশী মানসিকভাবে অখুশী হন। এছাড়া জীবনের অধিকাংশ সময় যেখানে কাটিয়েছি এবং যে দেশের মানুষ সেখানকার স্কুলবোর্ড নির্বাচনে আমাকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে সে দেশকে 'দেশ' না ভেবে অন্য কিছু কি ভাবা যায়? কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ সে তো অবশ্যই আমার দেশ, যেখানে জীবনের প্রথম অর্ধেক সময় কাটিয়েছি, বড় হঁয়েছি, পড়াশোনা করেছি সে 'দেশ' ছাড়া অন্য কি? আর বাংলাদেশ যেখানে, পালিয়ে আসার আগে পর্যন্ত, আমার পরিবারের আদি বসবাস, তা অবশ্যই আমার 'দেশ'।

আমরা আমেরিকায় প্রবিনী ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কিছু অনাথ, গরীবদের সাহায্য করে থাকি। এই সামান্য সাহায্যের ফলে অনেক সংখ্যালঘু আর্থিক সাহায্য অপেক্ষা মানসিকভাবে বল পেয়েছেন প্রচুর। তাই তো ১৯৯৭ সালের প্রথমদিকে বাংলাদেশে গিয়ে দেখি এক গ্রামের অতি দীন গরীব হিন্দুরা সকলে মিলে ১৯৫০ দশকে ভেঙে ফেলা ২৫০ বছরে কালীমন্দিরটা পুনঃনির্মাণে ব্যস্ত।

দক্ষিণ বাংলার এক গ্রামে একটা চারশ বছরের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে পড়েছিল। সেখানকার গ্রামবাসীদের অনুরোধে (পূর্বতন) জেলা অধিকর্তা, মন্ত্রীমশাই থেকে রাষ্ট্রপতিকে এটিকে নজর দেবার জন্য চিঠি লিখে জানাই। ১৯৯৬-এর জুন মাসে সেখানকার সরকারের তরফ থেকে আমাকে লিখিতভাবে জানায় যে সরকার পক্ষ থেকে সেই প্রতিষ্ঠানটিকে নজর দেওয়া হবে। এই কিছুদিন আগে (১৯৯৭) গিয়ে দেখি আশেপাশের এলাকাসহ সেখানে প্রাণচাঞ্চল্য এসে গেছে। ঢাকঢোল, কাঁসর, ঘন্টা বাজিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে এক অল্পবয়সী গ্রামবাসী গান ধরেছিলেন—

'দেখি বিদেশীর বেশে
এসেছ তোমারই দেশে'

যতবারই গেছি ততবারই তারা আমাদের সকলকে একেবারে নিজের করে নিয়েছেন।
সুতরাং সেই দেশকে 'দেশ' না বললে অন্যায় হবে।

আমাদের কথা তো অন্য। আমাদের মেয়ে জয়ীতা ও ছেলে শুভ, দুজনেরই জন্ম আমেরিকায়। তবুও, তাদের অন্য দুই দেশের বন্ধুবান্ধব, গ্রামবাসী, দাদু-ঠাকুমা থেকে মাসী পিসি সবাই বলেছে,

'তোদের এটাও দেশ'। এইতো এই বছরেই কিছুদিন আগে শুভ টিনএজার বয়সে একাই বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলা ঘুরে দেখে এলো। কোথাও সে একেবারের জন্য 'বিদেশী' বলে পরিচিত হয় নি। ঢাকায় সে দেখতে গিয়েছিল প্রবিনী ফাউণ্ডেশনের সাহায্যপ্রাপ্ত ঢাকা অরফানেজ সোসাইটি (হিন্দু) ১৯০৮ পরিচালিত ঢাকা বালিকা অনাথ নিবাস (যার জন্য সে নিজেও শ্রম দেয়)। এদের কাছে আমরা তাদের 'নিজের'। এদেশে ফিরে আসার পর প্রবিনী সাহায্যপ্রাপ্ত অনাথ নিবাসের এক ছোট বোন শুভকে লিখে জানিয়েছে ঃ

"পূজনীয় দাদা ঃ

আমার প্রণাম নিও। তোমাকে আমি দেখেছি।
আমার ভালো লেগেছে। বাবা-মাকে দেখি নাই।
দেখতে ইচ্ছা করে। তোমার সাথে আমি কথা
বলতে পারি নাই, লজ্জা হয়েছে।
.... আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি।

তোমার স্নেহের
অর্চনা"

১৯৯৭-এর গোড়ায় যখন আমরা কয়েকজন ওই অনাথ নিবাস দেখতে যাই তখন এক ভুক্তভোগী মহিলা, নিভাদেবী, আমাদের "দেশ"-এ স্বাগত জানিয়ে লেখেন ঃ

ঃ স্বাগত ঃ

উষ্ণ হৃদয়ের স্বাগত
প্রনতী হে অতিথি,
মোরা ছিন্নমূল অসহায়,
তোমাদের দানে, ভুলে যাই মোরা অসহায়,
মানুষ হবার, বেঁচে থাকার জন্য
আমাদের জন্য তোমাদের ত্যাগ
ভুলিনা আমরা
তোমাদের স্নেহের দানে,
প্রান ভরে আমরা নিতে পারি বাঁচার আশ্বাস
ভুলে যাই, আমাদের কেউ নেই
রয়েছ শুধু তোমরা।
পিতার স্নেহ, মায়ের আদর, বোনের ভালবাসা
দিতেছ তোমরাই
তবে কেন আমরা অসহায়?
না-না-না—এর কোনটাই আমরা নই

যেহেতু তোমাদের দান, ত্যাগ ভুলায় মোদের
পিতা, মাতা বোনের আদর।
এসেছ তোমরা, মোদের কিছুই নেই-দেবার
শুধু মোদের উষ্ণ হৃদয়ের উষ্ম স্বাগতমে
ভরে দিতে চাই হৃদয় তোমাদের,
আর তোমাদের কাছে চেয়ে নিতে চাই
মোদের বাঁচার অধিকার।
দিয়েছ, দিতে হবে, নিতে হবে মোদের ভার
প্রনতী লহ মোদের, হে অতিথি,
এটুকু শুধুই মিনতি মোদের।

শুধু ঢাকা নয়, প্রবিনীর সাহায্য যারা চেয়েছেন এবং যাদের আমরা সাহায্য করতে পেরেছি তার মধ্যে আছে কুমিল্লার রামকৃষ্ণ অনাথ নিবাস, বরিশালের রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাস, নোয়াখালির গান্ধী আশ্রম (অনাথ) ছাত্রীবাস, চট্টগ্রামের জগৎপুর আশ্রম অনাথ নিবাস। এরা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য শহর-গ্রাম যেমন বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে আমারা "সে দেশের"। ঠিক তেমনিই কলকাতা থেকে কন্যাকুমারী থেকে কোহিমা থেকে কাশ্মীরও মনে করিয়ে দিয়েছে যে আমরা সে দেশেরও বটে। সেই কারণে আমার পরিবার আমেরিকান ১০০%, আবার দেশেও ১০০% দেশী। অন্য অর্থে আমরা আমেরিকায় বাংলাদেশী ইন্ডিয়ান (Bangladeshi-Indian)। বংশের অর্থে রুট (Root) বা শিকড়টা ওখানে পৌঁছায়। যেমন আমেরিকায় ন্যাশনালিটি (Nationality) বা জাতীয়তা জিজ্ঞাসা করলে অনেকে পরিচয় দেন জার্মান-হাংগেরিয়ান (German-Hungrian) বা জুইস-রাশিয়ান-উজবেক্ (Jewish-Russian-Uzbek) বা এ্যাফ্রো-ক্যারিবিয়ান-আইরিস (Afro-Caribbean-Irish)। মানে একাধিক জাতীয়তাস্বত্তার অধিকারী।

এই সংকলনের লেখাগুলো বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। নাম, ধাম, গ্রামের সঙ্গে আসলের কোন মিল নাই। কয়েকটা প্রবন্ধ ১৯৯২-৯৩ এ ভয়াবহ দাঙ্গার পর লেখা। ১৯৯২-এর ডিসেম্বরের প্রথম দিকে নিউইয়র্ক থেকে রওয়ানা হবার আগে সকলেই বারণ করেছিল যেতে। কলকাতা থেকে বাংলাদেশ যাওয়ার সময় আবার সেই একই উপদেশ আসে। উপদেশ কার্য্যতঃ না মেনেই এসেছিলাম। ৮ই ডিসেম্বর ১৯৯২-তে যখন কলকাতা পৌঁছাই তখন সেখানে কার্ফ্। বিমানবন্দরের পুলিশ, বিমানবন্দর ইউনিয়ন, ট্যাক্সি ইউনিয়নের লোককে এক অবাঙালি ট্যাক্সিচালক টাকা দিয়ে আমায় বাড়ী পৌঁছে দেয়। কলকাতায় বিভিন্ন এলাকায় যেখানে হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত ও যেখানে মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত তা ঘুরে দেখি। অনেকেই যেতে বারণ করেছিল। কিন্তু নিজের দেশ তো। মেটেবুরুজ, খিদিরপুর থেকে কসবা, ট্যাংরা সব ঘুরে দেখি। এর ক'দিন পরে হিন্দু-বিরোধী পোগ্রোমে ক্ষতিগ্রস্ত ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম থেকে সিলেট ঘুরে দেখি। দাঙ্গা ও পোগ্রোমের ব্যাপারে পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের শাসক ও পুলিশের খুব একটা তফাৎ খুঁজে পাই নি। দুই দেশেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কোন মন্ত্রী ঘুরে দেখলেন না। বাংলাদেশের সরকারী পক্ষের বক্তব্য

"তেমন কিছু হয় নি" (১৭ই জানুয়ারী '৯৩ থেকে সংসদে আলোচনা দেখুন। শা. কবির পৃঃ ৮৩-৯৪)

এছাড়া ভোলায় অনেক হিন্দু মহিলা ধর্ষিতা হয়েছিলেন এবং অনেককে উলঙ্গ অবস্থায় থাকতে হয়েছে শুনে এক মন্ত্রীমশাই জানিয়েছিলেন, আগে জানলে তিনিও এই মজায় অংশ নিতেন।

কলকাতায় '৯৩ জানুয়ারীর গোড়ায় পশ্চিমবাংলা সরকারের ট্যুরিস্ট বিভাগের জাহাজ বাজেয়াপ্ত করে মন্ত্রীমশাই সাগরে বেড়াতে গিয়েছিলেন (দেখুন দৈনিক বর্তমান জানুয়ারী '৯৩)। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই জাহাজেই অনেকের মত আমারও হাজার টাকার টিকিটে সুন্দরবন বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল। অবশ্যই যাওয়া হয় নি।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে লেখাগুলো "স্বর্গের সন্ধানে" নামে লিখেছিলাম। 'দেশ' তো স্বর্গ। তাই স্বর্গের খোঁজে যা দেখেছি তাই নিয়েই লেখা।

১৯৯৬-৯৭-এ আমেরিকা ও বাংলাদেশের একটি দল নিয়ে বাংলাদেশের ও ত্রিপুরার ঐতিহাসিক মঠ মন্দির বিহার আশ্রম দর্শনে যাই। সেই নিয়েও কয়েকটা প্রবন্ধ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। যে সমস্ত পত্র পত্রিকা সাময়িকীতে আমার লেখা বিভিন্ন সময়ে যারা ছেপেছেন তাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কলকাতায় দুইবাংলা নিয়ে আমাকে অনেকে অনেক কিছু জানিয়েছেন। এরা প্রায় সকলেই আমার পিতৃস্থানীয়। তাদের সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করি।

সর্বোপরি আমার দাদা ডাঃ শঙ্কর ঘোষদস্তিদার যদি নিজের কাজকর্ম ফেলে আমাকে উৎসাহ না দিত তবে হয়ত আমার লেখা হয়ে উঠত না। আমাকে যারা লিখতে বা মত বিনিময়ে সাহায্য করেছে তারা সবাই নিজ গুণে খ্যাত। সেই সমস্ত জ্ঞানী লোকেদের অমায়িকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার চেনাজানা বন্ধু বা পরিচিত যারা আজকাল রাজনীতি করেন বা নাম করেছেন তাদের মধ্যে যে একটা নাক উঁচু এবং ইমপিরিয়াল ভাব লক্ষ্য করেছি, সেই সমস্ত জ্ঞানী লোকেদের মধ্যে তা একদম পাইনি।

বন্ধুবর তপন কুমার দাসকে এই বই বের করতে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ। এছাড়া অবিরাম উৎসাহ দিয়েছে আমার স্ত্রী শেফালী, কন্যা জয়ীতা ও পুত্র শুভ।

অনেকদিন বিদেশে থাকার ফলে বাংলা ভাষায় লেখার মধ্যে কিছু ব্যাকরণগত ভুল থাকতে পারে তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। লেখার মতামত সম্পূর্ণ আমার।

৪ঠা জুলাই, '৯৭ সব্যসাচী ঘোষদস্তিদার
নিউ ইয়র্ক

উৎসর্গ

মা, শ্রীযুক্তা নীহার কণা ঘোষ-এর
করকমলে

Questionnaire for Refugee Interview :

(SGD)

1. Name age (approx.), etc. নাম, বয়স-ইত্যাদি ________
2. Economic condition or profession কাজ, পেশা ________
3. Place and date of interview প্রশ্নত্তোরের তারিখ, জায়গা ________
4. Name and phone no. of interviewer প্রশ্নকর্তার নাম, ফোন নং ________
5. Q. Where is your desh (homeland)? আপনার দেশ কোথায়?
6. Q. How far was it from ________ (a major city)? এটা ____ শহর থেকে কতো দূর?
7. Q. How big was the village/city? আপনার গ্রাম কতো বড়ো ছিল?
8. Q. How long did you live in your home (village)? আপনারা কতো বছর-যুগ সে বাড়িতে ছিলেন?
9. Q. Please describe your desh home. আপনার দেশের একটু বর্ণনা দিন।
10. Q. How did you arrive in India/E Pakistan? আপনারা ভারতে (পাকিস্তানে) এলেন কিভাবে?
11. Q. Why did you leave? আপনারা কেন দেশ ছাড়লেন?
12. Q. People were leaving in spite of no rioting or because of rioting? দেশে কোনো দাঙ্গা হয়?
13. Q. How did you survive economically (after migration)? এখানে বাঁচলেন কি ভাবে?
14. Q. When did your father (or other family members) come? আপনার পরিবারের অন্যরাও এসেছিলেন?
15. Q. Did he sell your ancestral home? আপনারা বাড়ি-জমি বিক্রি করেছিলেন?
16. Q. Did he receive any compensation from any governments? আপনারা ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন?
17. Q. What about rest of your relatives? আপনার পরিবারের অন্যরা?
18. Q. Please describe your new (refugee) home. আপনার নতুন বাসস্থানের একটু বর্ণনা দিন।
19. Q. Were there any good or bad incidents at the time of your leaving? কোনো ভালমন্দ ঘটনা মনে পড়ে?
20. Q. How long did you live in your native village? আপনার দেশে আপনাদের কতো দিনের বাস?
21. Q. Any socialization with Muslims/Hindus? আপনারা মুসলমানের-হিন্দুর সঙ্গে মেলামেশা করতেন?
22. Q. Did your family want to stay there by force? আপনার পরিবার জোর করে থেকে গেলেন না কেন?
23. Q. Why did the Muslim stayed back in West Bengal? পশ্চিমবাংলায় মুসলমানরা থেকে গেল কেন?
24. Q. Why is this contradiction? কেন এ দ্বন্দ্ব?
25. Q. Anybody benefited? আপনার দেশভাগের ফলে কার লাভ হয়েছে?
26. Q. Were you ever persecuted after you came to India? ভারতে আপনারা নির্যাতিত হয়েছেন?
27. Q. Did you ever visit home after the last relative's departure? শেষ দেশ ছাড়ার পর আবার দেশে গেছেন?
28. Q. Do you want to visit? আপনি দেশ যেতে চান?
29. Q. What do you say your nationality as? কেউ আপনার দেশ কোথায় বললে এখন কি বলেন?
30. Q. Can Hindus and Muslims live together? কি মনে হয়, হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে থাকা যায়?
31. Q. Can you socialize with Muslims now? এখন মুসলমানদের সঙ্গে সামাজিকতা করতে পারেন?
32. Q. Any thing else you want to say? আরও কিছু বলার আছে যা-আমি জিগ্যেস করি নি?

২০১২-র নতুন সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম "এই আমার দেশ" ১৯৯৮-এর জানুয়ারিতে ছাপা হয়েছিল। আবার প্রায় ১৫ বছর পরে এই বই পুনরায় ছাপানোর দায়িত্ব নিয়েছেন রুদ্র আর মিলিতা। ওরা দুজনই অনেকদিন ধরে সপরিবারে বিদেশে রয়েছেন। বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ নেই বললেই চলে। ওদের সবার পরিবার পূর্ববঙ্গীয়, কিন্তু ওদের ভারতে জন্ম—দেশ ভাগের পরে সবার পরিবার পূর্বপুরুষের ভিটা ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

মিলিতা লেখকের প্রথম বই "এই বাংলা ওই বাংলা" পড়ে মানুষের ওপর দেশভাগের প্রভাব ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি বর্তমান যুগের বাঙালির কাছে তুলে ধরতে চান। ওরা প্রায় ২০ বছর পরে বইটি আবার ছাপানোর উদ্যোগ নেন।

সেটি ছাপা হয় জানুয়ারি ২০১২ সালে।

রুদ্র আর মিলিতা "এই বাংলা ওই বাংলা" পরে "এই আমার দেশ" ছাপাতে উদ্যোগ নেন। ওদের এই প্রচেষ্টা বহু প্রশংসিত ও ধন্যবাদের ওপরে। বিশেষ করে লেখক ড. সব্যসাচী ঘোষ দস্তিদারের কাছে। ওদের এই মহৎ উদ্দেশ্য কার্যকারী ও সফল হবে এটাই আমাদের কাম্য। ওরা প্রথমে লেখকের সাহায্যপ্রার্থী হয় এই ব্যাপারে। কিন্তু কাজের ব্যস্ততা, দেশের বাইরে বেশী সময় থাকতে হবে বলে ওদের সাহায্য করা অসম্ভব হয়। ওরা তখন আমার সাহায্যপ্রার্থী হয়। আমি এই সামান্য সাহায্যের জন্য তাদের বিমুখ করতে পারিনি। ওদের অদম্য উৎসাহ ও দায়িত্ব আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করেছে। বিশেষ করে এই দেশের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ওরা সময় দিতে প্রস্তুত এবং লেখকের গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আগ্রহী।

এই নতুন সংস্করণে প্রথম সংকলন থেকে কিছু লেখা বাদ দেওয়া হয়েছে এবং কিছু নতুন লেখা যোগ দেওয়া হয়েছে।

রুদ্র, মিলিতা আর সব শুভানুধ্যায়ীর উদ্দেশ্য সার্থক হোক।

৪ জুলাই, ২০১২ **শেফালী সেনগুপ্ত দস্তিদার**

নিউ ইয়র্ক

একটা আবেদন

দেশে অনেক পরিবার আছেন যারা ঘর-ছাড়া উদ্বাস্তু বা অনেক ঝড়ঝাপটার মধ্যেও দেশে আছেন, অথবা কেউ কেউ রক্ষাকারী অর্থাৎ অন্যকে দুর্যোগের সময় আশ্রয় দিয়েছেন বা প্রাণে বাঁচিয়েছেন। আমাদের ইন্ডিয়ান সাবকনটিনেন্ট পারটিশান ডকুমেন্টেশন প্রজেক্ট বা ইসপাদ (Ispad)[১] আপনাদের অভিজ্ঞতা জানতে আগ্রহী। সম্ভব হলে ভিডিও, নচেৎ লেখা ও ছবির সঙ্গে অডিও, নাহলে লেখা ও ছবি, তাও নাহলে শুধু লেখা। প্রয়োজনে আমাদের ইউটুবে (You Tube) Ispad অথবা Indian Subcontinent Partition Documentation চ্যানেলে (channel) সাক্ষাৎকার দেখতে পারেন। মোটামুটি নীচের লেখা বিষয়গুলো মিলিয়ে সাক্ষাৎকার বা উত্তর দিলে সবার বুঝতে সুবিধা হবে।

১। নাম, ঠিকানা, মা-বাবার নাম, পরিবারের অন্যদের বর্ণনা, আদিবাড়ির বর্ণনা দিন

২। ফোন নং, ই-মেল, কাজ, পেশা, প্রশ্নোত্তরের তারিখ, জায়গা।

৩। আদিবাড়ির জেলা, থানা, ইউনিয়ন? এর কাছের নামকরা শহর কি এবং কতো দূর? কিভাবে যাতায়াত করতেন? বর্ণনা দিন। কোন ইস্কুলে কোন সময়ে, কতো বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। কোন কলেজে কোন সময়ে, কত বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। যাতায়াত কিভাবে করতেন। ইস্কুল-কলেজের কথা একটু বলুন।

৪। আপনার গ্রাম কতো বড় ছিল? আপনার দেশে আপনাদের কতো দিনের বাস? গ্রাম সমাজের ব্যাখ্যা দিন।

৫। আপনারা কতো বছর বা যুগ সে বাড়িতে বা গ্রামে ছিলেন? দেশের বাড়ির-পরিবারের কথা বলুন।

৬। আপনারা পাকিস্তান থেকে ভারতে বা ভারত থেকে পাকিস্তানে এলেন কিভাবে?

৭। আপনারা কেন দেশ ছাড়লেন? দেশে কোনো দাঙ্গা বা অত্যাচার হয়েছে? কেমন? বর্ণনা দিন।

৮। নতুন দেশে বাঁচলেন কিভাবে? আপনার পরিবারের অন্যরাও এসেছিলেন? বর্ণনা দিন।

৯। আপনারা বাড়ি-জমি বিক্রি করেছিলেন? কেন বা নয় কেন?

১০। আপনারা ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন? কার কাছ থেকে?

১১। আপনার নতুন বাসস্থানের বর্ণনা দিন, প্রথমে ও পরে। উদ্বাস্তু হয়ে কখনো নির্যাতিত হয়েছেন?

১২। কোনো ভালমন্দ ঘটনা মনে পড়ে? একটু বলুন।

১৩। আপনারা মুসলমানদের ও হিন্দুর সঙ্গে মেলামেশা করতেন?

১৪। হিন্দুরা জোড় করে বাংলাদেশে (পাকিস্তানে) থেকে গেল না কেন?

১৫। আপনার দেশ ভাগের ফলে কার লাভ হয়েছে? হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে থাকা যায়?

১৬। শেষ দেশ ছাড়ার পর আবার দেশে গেছেন? আপনি দেশ যেতে চান? কেন বা কেন নয়?

১৭। কেউ আপনার দেশ কোথায় বললে এখন কি বলেন?

১৮। আরও কিছু বলার আছে যা আমি জিগ্যেস করি নি?

এছাড়া আপনি বা আপনারা যদি কাউকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন, থাকতে বা বাঁচতে সাহায্য করে থাকেন তো তার বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিন।

১৯। কাকে বাঁচিয়েছিলেন তার নাম, বয়স, দেশ।

২০। ঘটনার বর্ণনা।

২১। পরিবেশের বর্ণনা।

২২। কেন থাকতে বা বাঁচতে সাহায্য করেছিলেন?

২৩। এছাড়া অন্য কিছু জানানোর থাকলে বলুন।

ধন্যবাদ।

---

[1] Indian Subcontinent Partition Documentation Project. Inc., email ispad1947@gmail.com. Address: c/o Politics, Economics & Law Department. State University of New York, Old Westbury, NY11568.

সূচীপত্র

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই ঃ

- রিজিওনাল ডিসপ্যারিটিস এ্যান্ড রিজিওনাল ডেভালপমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল
- এই বাংলা ওই বাংলা
- কলকাতা ৩০০ ঃ মেমোয়ার্স অফ এ ডাইভার্স সিটি
- বেঙ্গল স্টাডিস ১৯৯৪ ঃ এস্যেস অন ইকনমিক্স সোসাইটি এ্যান্ড কালচার

নিভারাণীর স্বর্গবাস

গৌরীপুরে যখনই গেছি তখনই আমাদের জন্য ছুটে আসত নিভারাণী। এছাড়া আরও অনেকেই ছুটে আসত। আত্মার সম্পর্কে আমি ছিলাম নিভার কাকা—যদিও এটা গ্রামাঞ্চলের শ্রদ্ধার ডাক, বয়সের নয়। আমার ছেলেমেয়েরা নিভাকে নিভামাসী বলে ডাকত। যখনই গেছি ওরা যে কি করে আমাদের সাহায্য করবে তা বুঝে উঠত না। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছের ডাব দিত। পাড়া থাকলে নারকেল দিত। বাচ্চাদের দিয়ে গাছের চালতা পেড়ে দিত। নিভারা অত্যন্ত গরীব, সারা বছর দু'মুঠো অন্ন জুটত না। তবে গ্রামে ওনারাই ছিলেন আমাদের ভরসা। আর কি করে যেন আমরা ওদের ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। গ্রামে গেলে অন্তত হাতের বয়ে বেড়ানো জিনিষগুলো ওদের ওখানে রেখে নিশ্চিন্তে অন্য জায়গায় যেতে পারতাম। আর ওই বাড়ির বাইরে দরমা দিয়ে পায়খানা নামক জায়গাটাও অনেক কাজে লেগেছে, বিশেষত মেয়েদের জন্য।

দেশে যাওয়ার আগে প্রত্যেকবারই লিখেছি, এবারও নিভা আর ওর মা-বাবাকে লিখেছি যে, "অমুক তারিখ ঢাকা আসছি। তবে এবারে বোধহয় যাওয়া হবে না। সময়ের খুবই অভাব। বেশ কয়েক জায়গায় অবশ্যই যেতে হবে। ঢাকায় হয় নাসেরদা অথবা বিভূতিবাবুর বাড়ি উঠব...।"

ঢাকায় বাড়িতে পৌঁছেই খবর পেলাম যে গ্রাম থেকে আমার সঙ্গে কে যেন গতকালই দেখা করতে এসেছিল, বলেছে খুব জরুরী। কাল খুব ভোরে আবার আসার কথা। ভেবে পাইনি কেই বা আসতে পারে। ঢাকা আসতেও তো অনেক খরচা ও সময়-এর ব্যাপার। বাস, রিক্সা, স্টীমার, পায়ে হাঁটা। আমি যাদের চিনি তাদের পক্ষে তো এই টাকাও অনেক টাকা!

ঘুম ভাঙার আগেই বাসার কাজের ছেলেটি আমাকে তুলে দিল। "স্যার, আপনারে ডাকে।" গোছান দিয়ে নিচে নেমে দেখি লুঙ্গি ও জামা পরা একটি লোক। কথা বলার আগে আদাব ও নমস্কার জানিয়ে টিপ করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। আমি বাধা দিয়ে ওনার হাত ধরে নমস্কার জানিয়ে বললাম, "কিছু মনে করবেন না, এখনও চিনতে পারিনি।" ভদ্রলোক জোড় হাত করে হেসে বললেন, "মনে নেই কাকা? আমি রমজান। গৌরীপুর থেকে এসেছি। নিভার মা-বাবা পাঠিয়েছে। গেলবার যখন এসেছিলেন আমি তো আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে পাশের দুর্গাপুর গ্রামেও গেলাম। আপনার হাতের ব্যাগটা আমি কতক্ষণ নিয়েছিলাম। আপনি তো ফটোও পাঠিয়েছিলেন। মিষ্টি খাবার জন্য টাকা দিছিলেন।"

"হ্যাঁ মনে পড়েছে। আপনার মেয়ের নামই তো রাধা? তা রমজানবাবু এতদূরে এলেন কেন? কবে এসেছেন? আছেন কোথায়?"

"আমাকে বাবু সাহেব বলেন কেন? আমি তো চাষের লোক। আমি এক ফুফাতো ভাই-এর বাসায়, ওদিকে এক বস্তিতে থাকি। পরশু আইছি। কাকী বলে দিয়েছেন যে, আপনি যাতায়াত

খরচাটা দিয়ে দেবেন।" রমজানবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, মনে হয় নিজের মনটা স্থির করে আস্তে আস্তে আল্লা-রসূলের নাম নিয়ে কি একটা বলে বিড়বিড় করলেন। তারপর সরাসরি বলে ফেলেন, "নিভা আর নাই। সে মারা গেছে। ওর পনেরো বছরের মেয়েটাও শেষ হয়ে যেত, গ্রামেরই কোন এক মৌলবী আর কতগুলো ছ্যামরা ওর পেছনে লাগছিল। সে তো শুনেছি আপনারই কোন এক আত্মীয়, যে এখন ঢাকায় আছে, সেই তো পূর্ণিমাকে বাঁচিয়েছে। আপনার আত্মীয়ের সাথে কথা হয় নাই? গ্রামের লোকেরাই আমাকে পাঠিয়েছে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য।"

রমজানবাবু যা বললেন তা পরে আমার আত্মীয় কমলদার কাছেও শুনেছি। নিজের চোখে না দেখলেও ভুক্তভোগীর কাছে না শুনলে এ বিশ্বাস করতাম না। আমি জানি যে, দেশের গ্রামে নিরাপত্তা কম। তারপর মেয়েদের নিরাপত্তা গ্রামে এবং শহরে আরও কম। তারপর হিন্দু, খৃস্টান, বৌদ্ধ, আদিবাসী ধনী থেকে গরীব সবারই নিরাপত্তা নেই বললেই চলে। নিভারণী সেই গ্রামেরই এক মহিলা, বেশ স্মার্ট বা চতুর। মধ্যবিত্ত ঘরে মানুষ হলে অনেক কিছু করতে পারতেন। তবুও নিভা তার দক্ষতার বলে "স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমিতির" প্রধান হয়েছিলেন। পরে সরকারি অনুদানে "সমাজ সেবিকা"ও হয়েছিলেন। এতে কয়েকশ টাকা পেতেন।

দেশে আজকাল সংখ্যালঘু নির্যাতনের দুটো ধারা বর্তমান। একটা হল সংখ্যালঘু মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত হলে তাদের হেয় করার চেষ্টা হয় সরকারী, আধা-সরকারী, পুলিশ, মিলিটারী, আনসার, রাজনীতিবিদ, আমলা ও সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে। চাকরী না দেওয়া, কাজে বা পদোন্নতিতে বাধা দেওয়া, অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুলিশি রেকর্ড না রাখা, শত্রু-সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে জোর করে জমি-বাড়ি নেওয়া, বাড়ি-মন্দির-গীর্জা-ছাত্রাবাস-শ্মশান লুটপাট ও ধ্বংস, ইত্যাদি! আর গরীবদের পুলিশ, আমলা, রাজনীতিবিদদের সহায়তায় ভিটেমাটি নেওয়া ছাড়াও আছে নাবালিকাদের ধর্ষণ ও জোর করে ধর্মান্তরিত করা এবং স্ত্রী ও মাতৃস্থানীয়াদের ধর্ষণ। এ ছাড়া কোন কোন এলাকায় আছে হয় বিরোধীপক্ষ নতুবা সরকার পক্ষের অত্যাচার! নিভা ও তার পনেরো বছরের কন্যা পূর্ণিমার ওপর চাপ আসতে শুরু করে দুপক্ষের "গুণ্ডা বিপ্লবী"দের কাছ থেকে, জানালেন রমজানবাবু। অতঃপর মেয়ের হাত ধরে গভীর রাতে ঢাকা। সেখানে মা ও মেয়ে দুজনেই গার্মেন্টে কাজ, একটা জলার ওপর বাস এবং অনাহারে, অত্যাচারে, অপুষ্টিতে অপমৃত্যু। সুসময়ে দুঃসময়ে নিভা ছুটে আসত তার একমাত্র সহায় ওই কমলদার কাছে। দেশে আজকাল অনেক সংখ্যালঘুরা "সে মরিয়া বাঁচিল" বলতে পারবেন না। পারে নি নিভাও। অনেকের কাছে শুনেছি মৃতদেহ সৎকার করাতেও বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এক বন্ধুর কাকার মৃত্যুর পর অনেকেই হুমকি দিয়ে গেছেন "মালাউনের বডি অমুক সময় নেবেন না। অমুক পাড়া দিয়ে যাবেন না। অমুক রাস্তা বন্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি।" ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমরা যে কত নিচে নামছি তা ঈশ্বরও জানেন না। এমনকি ডাক্তার কাকার সহানুভূতিশীল বন্ধুরা, চিকিৎসায় ভাল হওয়া রুগীরাও সাহায্যের জন্য ইতস্তত করছেন অবশ্য নির্ভীক মেরুদণ্ডশালী কিছু লোক বাদ দিয়ে। নিভারণীকে দাহ করতেও কমলদার অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়! অবশেষে রামকৃষ্ণ মিশন ও অন্যান্য লোকের সাহায্যে একেবারে রাস্তার পাশে দাহ করা হয়। আজকাল অনেক শ্মশানও শত্রু-সম্পত্তি আইনের ছোবলে দেশের শত্রু হয়ে তা সরকার ধনী, মধ্যবিত্তের দখলে চলে গেছে। অনাথ ও অসহায়

পূর্ণিমা তার কমলাদাদুর কাছে বার বার একটাই প্রশ্ন রেখেছে—"মা স্বর্গ থেকে আমাকে দেখবে তো?"

রমজানবাবু শেষ ক'মিনিট বোধ হয় শুধু চোখের জলই ফেললেন, আর বলেছিলেন, "নিভাকে তো বাঁচাতে পারলাম না। আপনারা কিন্তু পূর্ণিমা আর অন্য পোলাপানগুলারে একটু দেখবেন।" ওনার সঙ্গে কথা শেষ হওয়ার আগেই এসে গিয়েছিল মুকুলবাবু, আদিত্য ও ভান্তে। আরও ক'জনের আসার কথা সেদিনই।

পরের দিন মুকুলবাবুর সঙ্গে তাদের গ্রামে নিমন্ত্রণ ছিল। বাড়ির দরজা খুলেছিলেন এক বিধবা মহিলা। আগেরবার ওনাকে দেখেছিলাম বিভূতি দত্তগুপ্তের বাড়ি। তখন উনি আর ছেলে, বৌ, নাতি সবাই বিভূতিবাবুর বাড়িতে কাজ করতেন। সেবারেই মাসী বলেছিলেন, "আমাদের বাড়ি অনেক দূরে, রংপুর ছাড়িয়ে গঙ্গাছড়িতে। সেখানে হাতের কাজ করতাম।" পরে এক সময় মাসীর সঙ্গে গল্প করতে করতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "মাসী, আপনাদের ওখানে কেউ মারা গেলে কি করেন?"

"কি আর করব, পুড়িয়ে দিই!"

"তাহলে আপনাদের ওখানে ভাল শ্মশান-টশান আছে?"

"হ্যাঁ।" অনেকটা আশ্বস্ত হলাম। মাসী আবার বললেন, "আমাদের ওখানে অনেক হিন্দু জেলে, তাঁতী, বামুন, চাষী আর কারিগর আছে। ওখানেই এক মন্দিরের পাশে আমাদের শ্মশান। ওই মন্দিরেই সব পূজা হয়। দুর্গাপূজাও। কিন্তু ছেলের শ্বশুর বাড়িতে ওদের খুব অসুবিধা ওদের বহু পুরান শ্মশান। এখন সেখানে পোড়াতে দেয় না। যারা পারে তারা ৩০-৪০ মাইল দূরে পাঠায়। কবরও দিতে দেয় না। মুখে আগুন দিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এখানেও দেখেছেন কি অসুবিধা?"

মুকুলবাবুর গ্রামে যেতে যেতে অনেক কথা হয়েছিল। সেখানে বেশ ক'ঘর সাঁওতাল ও খৃষ্টান আছেন। অনেকে খদ্দেরের জামাকাপড় তৈরি করে। যাওয়ার পথেই বলেছিলেন, "আপনার সঙ্গে দেখা করতে এক গরীব মহিলা আসবেন। মাঝে মাঝে আমাদের কাজ করে। কেন আসবেন জানতে চেয়েছিলাম, বলেন নি।

ঘর থেকে বেরোচ্ছি, হঠাৎ দেখি এক ভদ্রমহিলা চুপ করে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেললেন, এবং আমার হাতে দুটো পেয়ারা দিয়ে বললেন, "এটা আপনাগো জন্যে।" ঘোমটা টানা, চুলে সিঁথি নেই, পেছনে টেনে আচড়ানো। ডান হাত খালি, বাঁহাতে শুধু একটা লোহার বাঁকা বাঁকা চুড়ি। বাইরে মুকুলবাবুর সঙ্গে বোধহয় উনি কথা বলছিলেন এবং আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মুকুলবাবু ওনাকে দেখিয়ে বললেন, "এর কথাই বলছিলাম। ওর নাম আনোয়ারা। ও আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল।" আনোয়ারা দেবীর দিকে চেয়ে মুকুলবাবু বললেন, "লক্ষ্মী তুমি বলো না এনাকে যা বলতে চেয়েছিলে।" আনোয়ারা দেবী অনেকক্ষণ শুধু নিচে আমার পায়ের দিকেই চেয়ে রইলেন। অবশেষে আস্তে আস্তে ঘুরে হাঁটা দিলেন। মুকুলবাবু ডাক দিলেন, "যাও কই লক্ষ্মী? ডাক না অশোকরে?" একটু দূরে দাঁড়ানো একটি যুবক। ২২-২৪ বছর হবে হয়ত। "এই অশোক, এ দিকে আয় না। অতো দূরে কেন?' বললেন, 'অশোকের নতুন নাম

মাহ্‌বুব।"

হাঁটতে হাঁটতে আনোয়ারা দেবী কোনমতে বললেন, "বাবু, পারলাম না, আপনিই বলে দেবেন। অশোক আছে।"

আনোয়ারা দেবী হচ্ছেন গ্রামের প্রায় সাধারণ ব্যাপার যা আমাদের বুদ্ধিজীবীরা দেখেও দেখে না। ওনার আসল নাম শ্রীমতী লক্ষ্মী রাণী দত্ত। মুক্তিযুদ্ধের সময় ওনার পরিবারের একাংশকে হত্যা করা হয়, শ্বশুর সহ ওনার স্বামী অনিল, ছোট পুত্র-কন্যা ও বিধবা শাশুড়ি নিয়ে ঘর চালাচ্ছিলেন বাড়িতে ঝি-গিরি ও অনিলের একটা ছোট্ট দোকানের সাহায্যে। অল্প ক'দিনের মধ্যেই দোকানে হামলা। চরণডাঙ্গা ছেড়ে তাদের ভারতে চলে যেতে বলা হয়। দোকান ও ভিটেমাটি তাদের লিখে দিয়ে ঈশ্বরদি গেলেও চলবে না। নতুবা তখুনি দশ হাজার টাকা নগদ। অনিলবাবুর মা বলেছিলেন, "অতো টাকা পাবো কোথায়? দেশ ছেড়ে যাব কই? এ তো আমারই দেশ।" বছর ঘুরতেই অনিলবাবুকে দোকানেই হত্যা করা হয়। সবাই জানত কাদের কাজ, এমনি কি পুলিশও। পুলিশ, মোড়ল, মাতব্বররা বলেছিল, "হিন্দু, খৃস্টান, সাঁওতালদের করার কিছু নেই। টাকাটা দিলেই তো হত।" তবুও লক্ষ্মী দেবী যাবেন কোথায়? এর পর শুরু হয় মোড়ল-মাতব্বরের মানসিক অত্যাচার। "তোদের আর কি আছে? মালাউন হয়ে পড়ে আছিস কেন?" বন্ধু আত্মীয় প্রতিবেশী সাহায্য করতে এলে তাদেরও ইতরজনিত ভাষায় অভ্যর্থনা জানান হয়। বেশ কিছুদিন পরে শাশুড়ী দেবীর দেহ পাওয়া গেল পুকুরে এবং ওনার শেষকৃত্য শেষ হবার আগেই লক্ষ্মী দেবী, অশোক ও কল্যাণী "কিড্‌ন্যাপ্ট" হলেন "রক্ষা" করার নামে। এখানে প্রথমে ধর্মান্তকরণ ও একটি ছেলেকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এতে কাজ না হলে পুত্র-কন্যার সামনেই শালীনতাহানি। পরে লক্ষ্মী দেবীর পরিচিত এক মৌলবী মন্দির সংলগ্ন বাড়িতে আশ্রয় দেন এবং ধর্মান্তকরণের প্রস্তাব দেন। তখনও অসম্মতি জানালেও হবু স্বামীর সঙ্গে রাত কাটাতে হয়। এর পরেই লক্ষ্মীদেবীকে ধর্মান্তরিত হতে হয়। সেই প্রস্তাবিত লোকটির সঙ্গে তার দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে ঈশ্বরদীর কাছে একটি শহরে থেকে যান। লক্ষ্মীদেবীর ভয় ছিল এবারে না শুনলে তার নাবালিকা কল্যাণীর অকল্যাণ হবে। এ তো কোন মা চাইতে পারে না। অশোক জানালো, "আমরা কিন্তু এখনও মনেপ্রাণে হিন্দু" এবং আমি কি কল্যাণীর জন্য কোন হিন্দু, বৌদ্ধ ছাত্রীবাস-এ জায়গা করতে পারব কিনা। "আমরা কি এখনও হিন্দু?" মাহ্‌বুব আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে। "অবশ্যই আমাকে হিন্দু মনে করলে তোমরা নিজেকে তা মনে করতে পারবে না কেন?" বলেছিলাম। আজকাল কাগজের পাতায় রোজই কিছু না কিছু নারী নির্যাতনের কথা লেখা থাকে। মুসলমান, হিন্দু, খৃস্টান, বৌদ্ধ, শহরবাসী, আদিবাসী। তবে সংখ্যালঘুরা জনসংখ্যার মাত্র ১৩ শতাংশ হলেও ধর্ষিতা হচ্ছেন প্রায় ৫০ শতাংশ অভাগিনী। দেশের নারী আন্দোলনের ওপর বই ও ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহীর কাগজ খুললেই তা দেখা যায়। হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতার জন্য ধর্ষিতারা আবার সমাজে থেকেই ধর্ষিতা হচ্ছেন; গ্রাম, পাড়া, পরিবার, সমাজ এদেরই দোষী সাব্যস্ত করে পরিত্যাগ করছে। এ ব্যাপারে মুসলমান সমাজের উদারতা নির্যাতিতা মেয়েদেরকে অনেক সাহায্য করছে। ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হাজার হাজার মহিলা ও বালিকা পাকিস্তানী, স্বাধীনতা বিরোধী বাঙালী ও উর্দু ভাষীদের দ্বারা নির্যাতিতা ও অন্তঃস্বত্ত্বা হন। এদের বড় অংশই হিন্দু। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার

হাজার পুরুষ এদেরকে সমাজে টেনে নেন। তবে এখন বাংলাদেশে হিন্দু (বৌদ্ধ, খৃস্টানসহ) সমাজেও পরিবর্তন হয়েছে। এখন এই নির্যাতিতা-দের ঠেলে ফেলে না দিয়ে এদেরকে তাদের পরিবার, গ্রাম, সমাজ কাছে টেনে নিচ্ছে। এমনকি পুলিশে ও কাগজে এদের নামও ছাপা হচ্ছে। দৈনিক কাগজে এবং ঢাকার "নির্যাতন ও নিপীড়নের কিছু তথ্য" বই এর বিভিন্ন সংস্করণে অনেক নাম-ধাম দেওয়া খবর পাওয়া যাবে।

এক সময় খুলনার এক ভূমিহীন চাষী মৃণালিনী ডাকুয়ার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, উনি ভারতে পালাবার কথা ভাবছেন। কোথায় যাবেন জানতে চেয়েছিলাম, বলেছিলেন, "জানিনা।" কারণ জানতে চাইলে বলেছিলেন, "বড় মেয়ে অঞ্জলি ১৪য় পা দিয়েছে।"

কমলদা ঢাকায় নিভার সৎকারের ক'দিন পর পূর্ণিমাকে গ্রামে ওর দিদিমার কাছে পৌঁছে দিয়ে কলকাতা যাবেন ভেবেছিলেন। গ্রাম-দেশে খবর ছড়ায় বাতাসে বাতাসে। পূর্ণিমা কমলদার হাত ধরে গ্রামে ফেরার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই মৌলবীসাহেবের আবির্ভাব, এবারে সঙ্গে কয়েকজন যুবা। তাদের আর্জি "মাত্র কয়েকদিনের জন্য" পূর্ণিমাকে চায়। নিজের "মেয়ের মত করে" রাখবে। এবারে আদেশ নয় সনম্র, সবিনয় অনুরোধ। পূর্ণিমা তার দাদুর হাত শক্ত করে প্রার্থনা—"দাদু, আমারে ফেলে কোথাও যেও না কিন্তু। মা'ও স্বর্গ থেকে আমাদের আগলাবে!"

তর্পণ

অজয় চিন্তা করছিল সে প্রথমে কবে তর্পণ করতে গিয়েছিল পিতৃপুরুষদের স্মরণে। মনে করতে কষ্ট হচ্ছিল। তবে এইটুকু তার ভাসা ভাসা মনে আসছিল যে, বাবার হাত ধরে ভোরবেলায় সে একবার গঙ্গায় যায় দুর্গা পূজোর আগে, মহালয়ার দিনে, পিতৃপুরুষকে জল দিতে। তখন তার বয়স হয়ত পাঁচ কি ছয়। এটা তাদের কলোনীর বাসা থেকে হাঁটাপথে, প্রায় দু'মাইল। অজয়ের বাবা অবশ্য বলতেন যে, তিনি নাকি তাদের গ্রামে প্রত্যেক মহালয়াতে তার ছেলেমেয়েদের তর্পণ করতে নিয়ে গেছেন। সেখানে যেতেন আত্রেয়ী নদীতে অথবা তাদের ঠাকুরবাড়ি সংলগ্ন 'পুরনো দীঘি' পুকুরে। নেত্রকোনার কাছে তাদের গ্রাম দেহেরগতি ছেড়ে আসবার পর থেকে তাদের বাস এই 'বরেন্দ্র কলোনীতে'। একটি ঘরে তারা সাতটি প্রাণী বাস করতেন। মা-বাবা, দাদা অভয়চরণ, বোন গীতা, সীতা ও ছোট পিসীর বড় ছেলে শংকর। গ্রামের পিতৃপুরুষের দালান-বাড়ি ছেড়ে এই বাসাবাড়িতে আসার পর থেকেই মা-বাবার বচসা লেগেই থাকত তাদের গ্রামছাড়া ও এখনকার শোচনীয় অবস্থার জন্যে। অনেকদিন পর্যন্ত সে তার মা-বাবাকে কাঁদতেও শুনেছে। বুঝত না কেন। অতবড় পুরুষ মানুষটার কান্না শুনে খুব রাগও ধরত মাঝে মাঝে। 'অতবড় লোকের আবার কান্না কি?' ভাবত সে। এটাও মনে পড়ে যে তর্পণ করার সময় আর পাঁচজনের মত তিন, পাঁচ, সাত অথবা চৌদ্দ পুরুষের নামে জল দিয়েই থামতেন না। তিনি সাঁইত্রিশ না আটত্রিশ পুরুষকে জল দিতেন। নামগুলো না মনে পড়লে আবার গোড়া থেকে শুরু করতেন—'গুরুচরণ, রামচরণ, শ্রীচরণ, কালীচরণ...।' মাঝে মাঝে চুপ করে থাকতেন, চোখে জলও আসত যা তিনি অভয়, অজয়, গীতা, সীতাকে বুঝতে দিতে চাইতেন না। ছেলেমেয়েদের বুঝতে অসুবিধা হত না। পরে তারা জেনেছে যে ওই আটত্রিশ পুরুষ ধরে গ্রামের পূজামণ্ডপে তাদের পূজো হয়েছে এবং বাবা, শম্ভুচরণ, যেন তাদের পিতৃপুরুষের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন সেখানে পূজো করতে না পারার জন্যে।

আস্তে আস্তে গ্রাম থেকে ঘোষ, দত্ত, নন্দী, মুনসী, সরকার, দে, সেনগুপ্ত, দাস, কুলু, খাটুয়া, গোমেজ, গুহ পরিবার চলে গেছেন। ধনী, মধ্যবিত্ত, গরীব, অতি গরীব, মাস্টার, ব্যবসাদার, দোকানদার, ধোপা, নাপিত। এদের কাছ থেকেই দেশের খবরাখবর পেতেন আর ভাবতেন কবে দেশে ফিরবেন। আর দেশের খবর পেতেন অজয়ের মার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ও পড়শী মেহেরুন্নেচ্ছা (ডাক নাম ছানি) বিশ্বাসের কাছে থেকে। কয়েক বছর জোতদার বাড়ির সেলিমা বৌদিও মাকে লিখতেন, তা বন্ধ অনেকদিন। বেশ কিছুদিন আগে ছানিপিসী মাকে দুঃখ করে লিখেছিলেন, 'দিদি, এবারে আর পুজো হয়নি। ঠাকুরকাকা অবশ্য পূজো মণ্ডপ ঠাকুর আগলে বসে আছেন। উনি প্রদীপ জ্বেলেছেন। আমি ষষ্ঠীর দিন ভোররাতে পুকুরে ডুব দিয়ে ফুল বেলপাতা মণ্ডপে

রেখে এসেছি। তারপর বাড়িতে অনেকক্ষণ ধরে নামাজ পড়তে পড়তে তোমাদের কথা ভেবেছি। ঢাকের বাদ্যি ছাড়া গ্রাম, এত আগে ভাবিনি। ক'দিন ঘুমোইনি, শুধু চোখের জল ফেলেছি। বাড়ির কেউ অবশ্য জানে না...'। চিঠিটা আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার বাড়িতে কান্নার রোল। আর তার দু-একদিনের মধ্যেই শম্ভুবাবুর বুকের ব্যামো (হার্ট এ্যাটাক) হল।

ছানিপিসীর সঙ্গে অজয়ের মার চিঠি চালাচালি হত বিশেষতঃ পূজা, ঈদ, বিজয়া, নববর্ষ এইসব সময়ে। অজয়ের মজা লাগত দুজনেই দুজনকে 'দিদি' বলে সম্বোধন করতেন। ছানিপিসীর চিঠিতেই মা জানতে পারেন পূজো বন্ধ হবার কথা এবং তারপরও যে পূজামণ্ডপে রায়, হালদার, বর্মন, সাহা, দাউদ, গায়েন, কাইজার, কিস্‌কু পরিবারের ঘট ও ফুল রেখে যেতেন। ঠাকুরকাকা মণ্ডপটা সাজিয়ে রাখতেন এবং মুখার্জী ঠাকুরমা ঘটটা বিসর্জন দিতেন ও ফুলবেলপাতা নিত ঘরামী বৌমা। একবার নাকি ধনী বাড়ির কলেজে পড়া ছোট বৌ ফরিদা পূজোর সময় এক ঢাকি যোগাড় করে এনেছিল একদিন এবং মুখার্জি ঠাকুরমার সঙ্গে ঘট বিসর্জনেও গিয়েছিল। এ নিয়ে সারা এলাকায় খুব কেচ্ছা রটে এবং ঠাকুরমাকে অনেকে ভয় দেখিয়ে যায় গ্রাম ছাড়ার জন্য। ছানিপিসীর কাছ থেকেই সে জানতে পারে মুসলিম মাস্তান দ্বারা ঠাকুরকাকার ছোট মেয়ে দুর্গার "হারিয়ে যাওয়া" এবং কাকীমার শোকে দুঃখে মৃত্যু। নন্দীদের কাকার বড় মেয়ে পল্লবীকে সঙ্গে করে করিমগঞ্জ নিয়ে যাওয়া এবং ক'বছর আগে সেখানে তাকে পাত্রস্থ করা এবং ছেলে চৈতন্যের গোপালগঞ্জের আশ্রমে সন্ন্যাস নেওয়া এবং কাকার মণ্ডপ আগলানোর খবর। মা-বাবা অবশ্য তাদের বাড়ির খবরের আশায় থাকতেন যা পিসীমা কোনদিনই লেখেননি।

সেবার থেকেই দেহেরগতির লোকেরা চেষ্টা করে চলেছেন এদিকেই 'দেহেরগতির সম্মিলনী'র পূজো করতে। কিন্তু লোকে বলে দুর্গাপুজোয় লাখ কথা ও হাজার হাতের দরকার। খরচাও অনেক। সবারই অবস্থা খারাপ। এবারে কথা হয়েছে দেহেরগতির পূজা হবে। গেল বছর গ্রামের কাছে ঝামেলা হওয়ার পর সেখানকার কুমোর, ঢাকী, ময়রা সবাই এদিকে এসেছেন এবং কুণ্ডবাবুর ছেলে শুভ যে এখন একটা ট্যাক্সি চালায় সেই বড় অংশের টাকা দেবে বলেছে। ঠিক হয়েছে যে তারা অষ্টমী, নবমী, দশমী এই তিনদিন পূজো করবেন। কিন্তু সবাই মিলে ঠিক করেছেন যে পূজোকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে প্রথা অনুযায়ী দরকার পূজামণ্ডপের মাটি এবং আত্রেয়ী নদীর অথবা পুরনো দীঘির জল, তা নাকি গঙ্গাজল থেকেও বেশি দরকারী। এছাড়া দরকার ঠাকুরকাকারও। নারায়ণ ঘোষ যাকে শ্রদ্ধা ভরে ঠাকুরকাকা, ভোমঠাকুর, শিবঠাকুর এসব বলে সবাই ডাকে—যার পরিবার বংশ পরম্পরায় সবার সেবা করে এসেছেন, তাকে ছাড়া পূজো করা উচিৎ হবে কিনা সে নিয়ে খুব টানাপোড়েন চলেছে। নারায়ণবাবু আসলে চাষী এবং সঙ্গে বাঁশের কাজ করে অন্নসংস্থান করেন।

অজয় সাবালক হওয়ার পর থেকেই আর সব বন্ধুবান্ধবের মতই তর্পণ ও পূজাটুজা নিয়ে চিন্তা করত না। হঠাৎই মহালয়ার দুদিন আগে তার অন্তসত্ত্বা স্ত্রী, মিনতি, মাকে ডেকে দেখায় অজয় লিখছে ...।'

"আমি দেহেরগতি যাচ্ছি। চিন্তা কোর না। জল ও মাটি সময়মত নিয়ে ফিরব। নিজের শরীরটা দেখ...।'

অষ্টমীর ভোররাতে দরজায় শব্দ ও অজয়ের ডাক শুনতে পেলেন অজয়ের মা, কামিনী দেবী।

"মা দেখ কে এসেছে।"

দরজা খুলেই দেখেন অজয়ের সঙ্গে তাঁর ঠাকুরকাকা। কামিনীদেবী কি বললেন, বুঝতে পারার আগেই কাকাবাবু বললেন, "বড় বৌঠান, মা দুর্গার টানে এসে পড়লাম।" কামিনীদেবী আনন্দে দিশেহারা হয়ে তার কাকাকে ধরে আনন্দাশ্রু বইয়ে দিলেন। ঠাকুর কাকারও একই অবস্থা। সেই কাজের ভোররাতে জাগা প্রায় সবাই, পূজোর কাজে ব্যস্ত, আর একটি প্রাণীর ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্যও।

অজয়ের মা কোনমতে নিজেকে সামলে নিজেই ডাক দেন।

'ওরে তোরা বৌ-জামাই ছেলেমেয়ে নিয়ে আয়। অজয় সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণকে নিয়ে এসেছে। প্রণাম করে যা।' অজয়কে ডাক দিয়ে বলেন,

'তাড়াতাড়ি যা মা দুর্গা তো এসে গেছে, নারায়ণ কাকাকে মুখ দেখিয়ে আন।'

কামিনী দেবী কাকাবাবুকে ডেকে বললেন, "এবার কিন্তু আর ছাড়ছি না। বয়সও তো আর কম হল না। কষ্ট হলেও এখানেই থেকে যেও। তোমাকে যে আবার দেখব তা আর কোনদিন ভাবিনি।'

নারায়ণবাবু হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, 'আমার ভাগ্যে তিন তিনটে দুর্গা। কিন্তু আমার দুর্গারা তো পথ চেয়ে বসে আছে।' নিজের হাতে বানানো 'পূজোর মিষ্টি' বিতরণ করেই সবাইকে ডাক দিলেন, 'চল একবার তোমাদের গঙ্গায়। দেশে তো আমরা মহালয়ার দিন ডুব দিয়ে এসেছি। তারপর আমার মুক্তি।' আর দাদুর মুক্তির জন্যই বোধহয় অজয় স্মরণ করতে লাগল, 'গুরুচরণ, রামচরণ, শ্রীচরণ...।'

লাল বাড়ি, নীল বাড়ি

ধরুণ একটা দেশের একটা প্রদেশের রাজধানীর নাম 'ঝগড়া নগর', এটা আমারই দেশ কিন্তু রাজধানীর কি করে এরকম নাম হয়? এটা গল্প, তাই গল্পে সবই হয়। আসলে শহর প্রতিষ্ঠা কর্তাদের নাম রাখার ইচ্ছে ছিল ঝগড়া নিবারণ নগর। কিন্তু তাড়াতাড়িতে কে যেন নামটা থেকে নিবারণ কথাটা বাদ দিয়ে দিয়েছিল, দুষ্ট লোকেরা বলে এটা ইচ্ছাকৃত, দূরদর্শী মানুষের ইচ্ছা ছিল যে এখানে এসে সবাই তাদের ঝগড়া-ঝাটি মিটিয়ে ফেলে শান্তি সমৃদ্ধির দেশ গড়বেন।

ওই রাজধানীতেই কথামত গিয়েছিলাম লালবাড়িতে, দুপুর একটায় আসতে বলেছিলেন উদয়বাবু তার সঙ্গে দেখা করতে। উদয়বাবু হচ্ছেন রনজিৎবাবুর বাঁহাত আর রণজিৎবাবু হচ্ছেন দেশের মহানগর মন্ত্রী। শহরের বাসট্রামের শম্বুকগতির ভয়ে ট্যাকসি নিয়েই পৌঁছাই পৌনে একটায়। দরজার কাছে একজন পুলিশকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'অমুক ঘরে যাব কোন দিক দিয়ে?'

হাতের ইংগিত করে বললেন, 'ওখান থেকে পাশ নিন'। দেখলাম বড় নোটিশে পাশের কথা লেখাও আছে। পাশের কথা জিগ্যেস করতে এক ভদ্রলোক অভদ্র ভাবেই বলে দিলেন 'দুটোর পরে আসুন'।

মানে? আমার তো যেতেই হবে। একটায় আমার এ্যাপয়েনমেন্ট'।

'তাহলে আগে আসেন নি কেন? একটা থেকে দুটো আমাদের টিফিনের সময়। লালবাড়ির কাজের চাপের মধ্যে কি একটু টিফিনও খেতে দেবেন না?'

'যেতে আমাকে হবেই। অনেক দূর থেকে এসেছি'। মনে মনে বললাম, 'এই ক'দিন আগে পর্যন্ত তো আমিও এখানে কাজ করেছি। এই ব্যুরোক্রাসিতে, কিন্তু এ কি?'

লোকটি তেড়েমেড়ে বললেন, 'এ কি মগের মুল্লুক পেয়েছেন? আপনাদের সুবিধায় আমাদের কাজ করতে হবে?'

'অবশ্যই। আমাদের দেশে বলে সরকারী চাকুরেরা হচ্ছে জনগণের দাস, চাকর। কারণ আমাদের ট্যাক্স এর টাকায় তাদের মাইনে।' মুখ ফসকে বলে ফেললাম।

'ও সব বাজে কথা বলবেন না। এখানে পুলিশ-সিকিউরিটি আছে।' আজকাল তো শিশুরাও পুলিশকে ভয় পায় না, আমরা ছোটবেলায় যা পেতাম। বুঝলাম না লোকটি আমায় এমনভাবে কেন ভয় দেখালেন। ক'বছর আগে যখন সস্ত্রীক লালবাড়িতে একটা কাজে যাই তখন তো এক আমলা-ভদ্রলোক কিভাবে আমাদের আপ্যায়ন করবেন তা বুঝে পাচ্ছিলেন না। আর এ কি? ইতিমধ্যে জনা কয়েক পুলিশ এসে হাজির। এনারা কথাবার্তা শুনছিলেন : আমার কথা আবার শুনে একজন আরেক জনকে বলে, 'এই ও (শালা) কে ছেড়ে দে'। তৃতীয় পুলিশটি আমাকে আরেকটি দরজা দেখিয়ে বলেন, 'ওই গেটে যান'। সেখানে আবার গোড়া থেকে শুরু। আধুনিক

দারোয়ান-ভদ্রলোক ফোন-টোন করে অনেক জেরার পর আমাকে যেতে দিলেন। তখন আমি পনের মিনিট দেরিতে।

একান্তসচিব উদয়বাবুর কাছে ক্ষমা চাইলাম পনের মিনিট দেরি হয়েছে বলে। উনি আমাকে দেখে আকাশ থেকে পড়ে বললেন, 'ও, হ্যাঁ, বলেছিলাম বটে, তবে বুঝিনি যে আপনি আসবেন।' আমি বোধ হয় হতবাক হয়ে বড় একটা হাঁ করে দাঁড়িয়েছিলাম কতক্ষণ। একান্তসচিব বললেন, 'বসুন। এনার সঙ্গে কথা শেষ হলেই এখুনি ডাকছি।' সেই যে বসলাম কত ইনি উনি ঘরে ঢুকছেন বেরচ্ছেন, আমার আর ডাক পড়ে না। কোন এক বাবুর পিওন উপদেশ দিলেন, 'কি এখনও বসে আছেন মশাই। যান, সোজা দরজা ঠেলে ঢুকে যান। আমি পঁচিশ বছর এখানে বাবুদের কাজ করছি। কিসে কাজ হয় তা আমার জানা। দেখছেন না কত লোক আসছে যাচ্ছে। আপনার আর হবে না।' অবশেষে তাও গেলাম। একান্তবাবু এখনও ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখুনি ডাকছি'। আবার বসে। আবার আলাপ। বাবুদের পিওনের মধ্যেই একজন সহৃদয় ভদ্রলোক বললেন, 'উনি কি কাজ দেবেন? তাই এসেছেন?'

'না।'

'বাড়ীর ফ্ল্যাট?'

'না'।

'জমি?'

'না। কিন্তু এসব কি বলছেন। এসব উনি কোত্থেকে দেবেন?'

'পার্টি?'

'উনি পার্টি দিচ্ছেন? কবে?'

'সেই পার্টি নয়। তাহলে এসেছেন কেন?' বুঝিয়ে বললাম, যে এক দূরদেশ থেকে আমাদের প্রিয় 'মাকালী নগরী'র তিনশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে বই বার করা হচ্ছে সেই বইতে মহানগরবাবু তার মতামত রাখবেন কিনা সেইটা জানবার জন্য। সহৃদয়বাবু বললেন, 'কি, পার্টি ধরে আসেননি বুঝি?'

'বুঝলাম না আপনার হেঁয়ালী।'

'আপনি কি জানেন না। যে এসব দেখা-টেখা করতে হলে রাজনীতির পার্টির কোন লোককে দিয়ে লিখিয়ে আনতে হয় বা ফোন করিয়ে নিতে হয়। দেখছেন তো এতক্ষণ বসে আছেন। ওই লোকগুলো মন্ত্রী মশাইয়ের ঘরে আসছে যাচ্ছে কি করে? কাউকে টাকা দেন নি?'

'টাকা কেন দেব? এই তো মেয়রবাবুর সঙ্গে দেখা করে এলাম। উনি তো ফেচাং না করে সরাসরি তৎক্ষণাৎ আলাপ করলেন। ওনারা কি একই পার্টির?'

'সেটা আপনার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। আপনার যদি এইমত কাজ হয় তো আমার নাম কালীকৃষ্ণ পালটে ঘেঁটুকুমার রাখবেন।'

সহৃদয় মশাইয়ের নাম কালীকৃষ্ণ পালটে অন্য কিছু রাখতে হয় নি। বাঁহাতিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল অবশেষে। আমাদের পুরনো চিঠির হদিশ না পাওয়ায় আবার দরখাস্ত করতে বলেছিলেন, আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে। তাও দিয়েছিলাম, তৎক্ষণাৎ। সঙ্গে আমার কার্ড ও বইটার ওপর

লেখক-সুচিসহ দু'পাতার বর্ণনা। দেখেটেখে বলেছিলেন, 'এতে চলবে না। টাইপ করে দিতে হবে, অফিশিয়াল প্যাড চাই' ইত্যাদি। বেরবার মুখে সেই নাম-না-পাল্টানোবাবু এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি আবার আসতে হবে তো?' শুনে বললেন, 'ওসব বাজে কথা। অনেক মন্ত্রী দেখলাম ক'যুগ ধরে। আপনাকে আগেই বলেছিলাম। এখন হচ্ছে করাপশন, ঘুষের সময়'। আপত্তি করে বলেছিলাম, 'এই তো আগের বার দেখা হল মন্ত্রী বিপদতারণবাবুর সঙ্গে। এক ডাকেই তো তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল। ধনীপাড়ায় থাকেন, তবুও তিনি নিজে হাতে চা নিয়ে এসেছিলেন। সঙ্গে পিঠে ও মোয়া।

'ওঃ। বিপদবাবু? খুবই পণ্ডিত লোক। উনি তো আপনাদের ওদেশে ছিলেন। উনি তো আপনার পার্বতীপুরের লোক, তাই হয়ত দর্শন পেতে সুবিধা হয়েছে'। ঘোরতর আপত্তি করেছিলাম। তবে ঠিক এটা মনে পড়ে যে ঢোকার পরেই বিপদবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি পার্বতীপুরের? খেয়েছেন কোনদিন সেখানকার পিঠে ও মোয়া? গিয়েছেন কোনদিন পার্বতীপুর?' এক ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন কমল আবুল ফজলের বাড়িতে। কমলের স্ত্রী বীণা ফোনটা আমাকে দিয়ে বললেন, 'দাদা আপনার ফোন'। ওদিক থেকে প্রশ্ন এল, 'আদাব, আপনি ডঃ দস্তিদার?'

'আদাব নমস্কার। আপনাকে চিনলাম না।'

'ডঃ সব্যসাচী ঘোষদস্তিদার?'

'হ্যাঁ।'

'অমুক জায়গার? অমুকের বন্ধু?'

'হ্যাঁ'।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যেন। বললেন, 'নমস্কার' আমি আদিত্য বাউড়ি। দেশের ওই অফিসের আমলা। রওশনের ক্লাসমেট। ওই রওশন, যার বাড়িতে আপনি ছিলেন ক'দিন আগে ও আর আমার পরিবারও পার্বতীপুরের, তবে দেড়শ বছর আগে ছেড়ে গেছেন সিলেট...'। আরও কত কথা। ওনার অফিসেই যাওয়ার কথা হল। আদিত্য প্রথম আলাপেই আমাকে 'তুমি' করে সম্বোধন করতে বলেছিল, ও কাজ করে একটা সোনার দেশে। সেটাও আমার দেশ। সেটার রাজধানীর নাম মহাদেবপুর। তবে এখন আদর করে তাকে অনেকে ছায়া বা ছায়াগ্রাম বলেন। সেখানের উঁচুপদের আমলারা বসেন যে বাড়ি তার নাম 'নীলবাড়ি'। সেখানেই আমার এ্যাপয়েন্টমেন্ট।

সকালে যাওয়ার আগে দেখি আদিত্যের পথনির্দেশ নেওয়া হয় নি। একটা নম্বরে ফোন করলাম।

'আচ্ছা, আদিত্য বাউড়িকে দেবেন?'

'কাকে?'

'আদিত্য...এ্যাসিট্যান্ট সেক্রেটারি হবেন বোধ হয়।'

'এখানে? এটা কোথায় ফোন করছেন জানেন? এটা ফরেন মিনিস্ট্রি। এখানে কোন বাউড়ি-টাউড়ি কাজ করে না।'

'সে কি কথা? আপনি ভুল করছেন...'

'এটা তো আর সে দেশ পাননি।' গলাটা নামিয়ে বললেন, 'এই নম্বরে দেখুন। ছয় দুই এক...।'

সেখানে ফোন করলাম।

এক ভদ্রলোক অভদ্রভাবেই বললেন, 'এটা কি মগের মুলুক?' কোথায় যেন এই কথাটা শুনেছিলাম? 'ওই রকম নামের লোক এই ডিপার্টমেন্ট এ পাবেন না,' বলেই ফোনটা নামিয়ে রাখলেন। আমার মগ বন্ধুদের বলা তাদের দেশের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেছিলাম। পারছিলাম না। অবশেষে এদিক ওদিক ধাক্কা খেতে খেতে শেষমেষ রওশনবাবুর থেকেই খোঁজ পেলাম। দেখা-করার সময়ের একঘণ্টা আগেই পৌঁছে প্রধান ফটকের উল্টোদিকে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। প্রথমে একা। কিন্তু পরে গুটি গুটি করে গা ঘেঁষে আরও কয়েকজন এসে দাঁড়াল। দেখে মনে হল সবাই নিম্নবিত্ত ও গাঁয়ের লোক। কয়েকজন তার ফর্ম ভর্তি করার জন্য সাহায্য চাইলেন। দেশের লোকেরা বিশেষতঃ গ্রামের লোকেরা অনেক সাধাসিধে হয়। ক'মিনিটে তারা যেভাবে আমাকে তাদের করে নিলেন তাতে আনন্দে আমার দুহাত তুলে বলা উচিৎ ছিল, 'হরি বোল, হরি বোল'। অনেকেই তাদের হাঁড়ির খবর দিলেন। কার তার শালার সঙ্গে বিবাদ, প্রতিবেশীর ঝামেলা। কেউ বা পুকুর চুরির গল্প। কেউ বা জানালেন তার পীরের মাহাত্ম্য। একজন আবার সিগারেট অফার করলেন। এর মধ্যে একমাত্র একা এক মহিলা মাঝে মধ্যে রাস্তার ওপারে যাচ্ছেন, নীল পোষাকের দারোয়ান-পুলিশের সঙ্গে কথা বলছেন, এবং এদিকে ফিরে আসছেন। মাথার ঘোমটা টানা লাল—নীল ডুরে শাড়ি। শেষবারে এদিকে আসতে মনে হল চোখের জল মুছছেন। পাশের তখনও নাম-না-জানা ভদ্রলোক উৎসুক হয়ে আমায় বললেন, 'দেখুন তো, কি হল। মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা সুবিধার'।

'না না, এটা ওনার প্রাইভেট ব্যাপার।'

'প্রাইভেট আবার কি? এখানে এসেছেন। আপনিই একাই দেখুন'। আদেশ দিলেন উৎসুকবাবু।

'কি হল? ওরা ঝামেলা দিচ্ছে?' বললাম। উত্তর দিলেন না শ্রীমতী ডুরে শাড়ি। তখন অন্য ভদ্রলোকটি ওনাকে আদেশ দিলেন বলার জন্য। ডুরে দেবী বললেন যে, তার নাম বিরজা রাণী সেনগুপ্ত। এবং তার নাবালিকা মেয়ে দুর্গাকে পাড়ার মাস্তান জোর করে বিয়ে করেছে এবং উনি মন্ত্রী বরাভয় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান মেয়ে উদ্ধারের কাজে। ততক্ষণে আমার রক্তের চাপ অনেক বেড়ে গেছে বুঝলাম। কিন্তু পাশের সবার রাগ বোধ হয় আমারও দশগুণ। দু একজন তো বোধ হয় আস্তিনও গুটোচ্ছিলেন। অগত্যা সবার একান্ত অনুরোধে (আসলে আদেশ) আমিই হলাম ফালতু মাস্তান। নীল দারোয়ানকে বললাম, 'এনাকে যেতে দিচ্ছেন না কেন? এনার মেয়ের জন্য বরাভয় সাহেবের এ্যাসিন্ট্যান্ট এর সঙ্গে দেখা করতেই হবে।' একটু রাগত স্বরেই নীলবাবু বললেন, 'আপনি ওনার কে? ওনার হাস্‌বেন্ড?'

'না'। বিরাজদেবী তাকিয়ে দেখলেন। বললাম, 'আত্মীয়। ওনার স্বামীর বন্ধুও বলতে পারেন।' আমিও গেট পাস-এর জন্য অপেক্ষা করছি। হঠাৎই দেখা হয়ে গেল।

'থাকেন কোথায়? দেশ?'

'সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে'। নীলপ্যান্ট সাহেব বিশ্বাস করলেন না। তবুও তার সঙ্গে ফোনে কথা বলে আমাকে ফোনটা দিয়ে বললেন, 'এখানে কথা বলুন'।

ওদিক থেকে এক ডেপুটি সেক্রেটারি ফোনে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর ইউ হার

রিলেটিভ? আপনি ওর আত্মীয়? হাউলং আর ইউ ইন সাগর পাড়? সাগর পাড়ে কতদিন আছেন?...।' ডেপুটি সাহেব তার জেরা শেষ করে বিরজাদেবীকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। বিরজাদেবী ওখানেই টিপ্ করে প্রণাম করতে যাচ্ছিলেন। আমার আত্মীয়ার সঙ্গে সেই শেষ দেখা।

অপর ফুটপাতে ফিরতেই আগ্রহভরে সবাই এগিয়ে এসে তাদের প্রশ্নবান ছাড়লেন। উৎসুকবাবু জিজ্ঞাসিলেন, 'আপনি কি বললেন?'

'আমি বিরজাদেবীর আত্মীয় এবং ইংরেজিতে বলেছি সেকথা'।

'সে কি? ওনাকে তো মনে হল অন্যধর্মের। আপনি কি করে নিজেকে অন্যধর্ম বলে চালালেন?'

'আমিও তো অন্যধর্মের। আমার মা-বাবা তো অন্যধর্মের। আর উনি অন্যধর্মের বুঝলেন কি করে।'

'আপনার কথা ওরা বিশ্বাস করল? আমাদের পুলিশ তো?' আবার বোঝালাম।

'সত্যিই? আপনি অন্যধর্মের?' চোখগুলো যেন ঠিকরে বেরিয়েছে। 'কিছু মনে করবেন না। অনেক কথা বলেছি, বললাম, "অন্যধর্ম হলে ভাল না খারাপ?" আমার নতুন বন্ধুরা থতমত খেলেন। যেন ভূত দেখেছে! 'আপনারা তো কারও বিরুদ্ধে কিছু খারাপ কথা বলেননি। যা বলার সত্যিই বলেছেন'।

পাশ থেকে এক দাঁড়িওয়ালা মাঝবয়সী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার জমিবাড়ি কি নিয়ে নিয়েছে? সেইজন্য এসেছেন? এই শালারা আপনাদের থাকতে দেবে না?...।' উনি এসে আমায় জড়িয়েই ধরলেন। তারপর আরও কত কথা।

গেটে বলা ছিল, তাই আদিত্যর ঘরে পৌঁছলাম ঠিক কাঁটা মিলিয়ে। দেখি মোটামুটি বড় আড্ডারই ব্যবস্থা হয়েছে। আট-দশজন ঘাঘু আমলা। দেশের ধারক-বাহক। অফিসে এ সময়ে এ রকম আড্ডা হতে পারে জানা ছিল না। তবে তখন টিফিনের সময়। সেক্স থেকে সেক্সপীয়র, ভোলানাথ থেকে ভায়োলেন্স, ঢাকা থেকে ঢাকুরিয়া। এরই মধ্যেই শ্রীছদরুল তার লেখা এক বই উপহার দিলেন। ওর মধ্যে থেকে একটা চ্যাপ্টার বার করে দেখালেন। 'আপনাদের জন্য আমাদের দায়িত্ব'। বলেই বললেন, 'এদের একটু সাহায্য করুন'।

'সে আবার কি কথা?' এক টাই পরা ভদ্রলোক রেগে উত্তেজিত হয়ে জানালেন, 'আমরা হলাম শাসক, আমাদের শোষক মন্ত্রীদের ডান ও বাঁ হাত। আমাদের কথায় সারা দেশ উঠছে বসছে আর উনি সাতসমুদ্দুরবাবু আমাদের উদ্ধার করবেন?' আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। আদিত্যের সঙ্গেই কথা হল না। অবশেষে উত্তেজনার মধ্যে একটু ফাঁক পেয়ে আদিত্য ও আসগার বলে গেল, "কালকে আপনাকে দু-একদিনের জন্য একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করেছি। কোথায় সেটা পরে জানাব।" এই প্ল্যানের জন্য আমার কোন অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। আমার দেশের আতিথেয়তার এই রকমই ধরণ। আরও কে কে যেন ঠিক করেছিল তারাও সঙ্গে আসবে এই ঝটিকা ট্যুরে।

ভোরে রওয়ানা হওয়ার সময় জানলাম যাচ্ছি আদিত্য ও আসগার-এর মা'দের প্রণাম জানাতে। তারা পিঠে আর মোয়া বানাচ্ছেন। গন্তব্য পার্বতীপুর।

জেল-এ ক' ঘণ্টা

কারাগার সম্পর্কে আমার খুব একটা ধারণা নেই। এই ধারণাটা থাকার কারণটা সবাই সৌভাগ্যই মনে করে। আমাদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী যে সব পরিবারের জেল-এর সঙ্গে মোলাকাত, সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে তাদেরকে 'দুর্ভাগা' বলা হয়—অবশ্যই কারাগারের কর্মচারী বাদ দিয়ে।

কিছুদিন আগে শ্রীলোকেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত-এর 'অপরাধে' আমাকেও ক'ঘণ্টা জেলে কাটাতে হল।

কারাগারের সম্পর্কে যে একেবারে অজ্ঞ তা অবশ্যই নই। স্বাধীনতা ও দেশভাগের আগে দাদু তো অনেকবার জেল খেটেছেন। মেজমামাও জেলে ছিলেন অনেক বছর। সেখান থেকেই স্নাতক (বি.এ.) হলেন। একবার পুরুষদের বদলে ও পুরুষরা জেলে থাকার কারণে দিদিমাকেই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে যেতে হয়েছিল আলিপুরের জেলে। এই কলকাতায়। কিন্তু হায়! দাদু-দিদিমা স্বাধীন হয়েও হলেন পরাধীন। দেশ ভাগের ক'বছরের মধ্যেই হলেন দেশছাড়া। মুসলিম সন্ত্রাসের ৪৮ ঘণ্টার বাড়ি আক্রমণের নোটিসের তাড়ায় চোদ্দপুরুষের ফরিদপুরের ভিটে ছেড়ে এলেন অন্যপুরুষের ২৪ পরগণার ভিটেতে। এর প্রায় তিরিশ বছর পরে জেলে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল বানীকে দেখার জন্য। বানী আমাদের ছেলেবেলার বন্ধু। ছিল ওই দিদিমারই জেল-এ। ৫০ বছর পরে, ১৯৭০-এর দশকে। এবারে দেশ স্বাধীনতা নয়, সন্ত্রাসের নামে নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে প্রায় হত্যার দায়ে। কিন্তু তখন সবাই বলল, 'যাস না, জায়গাটা ভাল নয়।" যাওয়া আর হল না।

লোকেন্দ্রবাবুর অপরাধটাও ছিল সন্ত্রাসের। ব্রিটিশকে দেশ ছাড়া করবেনই। যুগ পালটেছে, তখনকার অপরাধ, এখনকার গৌরব। ওনাদের মত অপরাধী ছিলেন বলেই না আমরা মাথা উঁচু করে আছি। সেদিন ছিল "শহীদ দিবস"। এই দিনে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কারাগারে অনুষ্ঠান হয়। কলকাতার ও পশ্চিমবাংলার প্রধান অনুষ্ঠানটা হয় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে (এখনকার প্রেসিডেন্সি জেল)। সঙ্গে ছিলেন আরও অনেকে। মাখনবাবু, বিরজাবাবু, মিহিরবাবু ও অন্যান্য কয়েকজন যারা সবাই জেল খেটেছেন এইখানেই। তবে ভাগ্যের কি পরিহাস। ওনারা ব্রিটিশদের দেশ ছাড়া করলেন ঠিকই, তবে নিজেরাও হলেন দেশছাড়া। জন্মভূমি ছেড়ে এলেন অন্যভূমে। এছাড়া জেল-না-খাটাও দু-চারজন ছিলেন, আমি তো সেই দলেই।

সময়মত জেলখানায় পৌঁছে বুঝলাম আমার দেশে সহজ ব্যাপারগুলোও জটিল। প্রথমত আমাদের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দৃষ্টির বাইরে। বড় দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এবং সেগুলো দেখতে চাওয়াও যেন গুরুতর অপরাধ। তদোপরি আমাদের হাতে ছবি তোলার জন্য ছিল ক্যামেরা ও ভিডিও। ক্যামেরাটা নিরঞ্জনদার হাতেই ছিল। ও এক নামকরা সাংবাদিক। এটা আমার কল্পনার বাইরে যে

সরকারকৃত স্মৃতিসৌধের ফটো তোলার জন্য অনুমতি লাগতে পারে! এ যেন শহীদদের স্মৃতিকে আমাদের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা। হাল্লারাজার দেশে কি এ রকম হত? না কি "ষ্টার ট্রেক" ছায়াছবির "ক্রিটন" গ্রহে। ইংরেজ আমলে না হয় বলতাম সাহেবদের "কলোনিয়াল" মেন্টালিটি, উপনিবেশবাদ মনোভাব। কিন্তু এখন কি বলব? লোকেন্দ্রবাবু সরাসরি মন্ত্রিমশাই-এর কাছ থেকে আমার ভিডিও নেবার অনুমতি নিয়েছিলেন তথাপি জেলারমশাই আবার লালবাজারে ফোন করে খোদ পুলিশের বড়কর্তার কাছ থেকে অনুমতি আনতে হল। বুঝিনা এই পুলিশ ও মন্ত্রীরা কোথায় যান যখন চোখের সামনে বিমানবন্দরে, ফুটপাতের দোকানে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে মানুষ ঘুষ দেয়! শহীদরা কি এটাই চেয়েছিলেন? শহীদ স্মৃতি-স্তম্ভ দেখার আগে গুনে গুনে নাম লিখে ঢুকতে হল, বেরবার সময়ও তাই। সাধারণ মানুষের পথে বাঁধা অনেক। আমার সৌভাগ্য শুধু যে আগের দিনের স্বাধীনতা-কামী এবং আজকের সত্তর আশি বছরের যুবাদের তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গী হওয়া তাই নয়, সঙ্গেই কারাগারে এক ভদ্রলোকের টুর গাইড পাওয়া। ওনারাই বলে যাচ্ছিলেন আলিপুর জেল-এ শহীদ হয়েছেন হুগলীর কানাইলাল দত্ত (১৯০৮), মেদিনীপুরর সত্যেন বসু (১৯০৮), খুলনার চারু চরণ বসু (১৯০৮), ঢাকার বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত (১৯১০), হুগলীর গোপীমোহন সাহা (১৯২৪), ১৯২৬ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল-এ শহীদ হন শ্রীঅনন্ত হরি মিত্র ও প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী। ওই সেন্ট্রাল জেলেই শহীদ হন ঢাকার শ্রীদীনেশ গুপ্ত (১৯৩১), চট্টগ্রামের শ্রীরামকৃষ্ণ বিহাস (১৯৩১), ২৪ পরগণার শ্রীদীনেশ মজুমদার (১৯৩৪)। এছাড়া জানালেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সন্ত্রাসবাদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাহোর থেকে উত্তরপ্রদেশ, আন্দামান থেকে ঢাকা—চট্টগ্রাম বরিশাল, আর আসাম থেকে পুনা সব জায়গাতেই স্বাধীনতা কর্মীরা হয় ফাঁসিতে নয় গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দেন। দেখানোবাবু আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন যেখানে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন জানালা শূন্য একটা ঘরে, যেখানে ফাঁসি দেওয়া হত ও অন্য জায়গা। ফাঁসি কাঠটা সেদিন ফুল দিয়ে সাজানো ছিল। কিন্তু ভদ্রলোক বললেন ফটো নেবেন না কিন্তু। এই ক'দিন আগেও তো জোড়া ফাঁসি হল। কি খারাপ জিনিষ। কিন্তু কেন "খারাপের" সঙ্গে ভালোটা জড়িয়ে যাচ্ছে? যেন শহীদদের স্মৃতি বাঁচাতেও চাই, আবার যেন সেটা বাঁচানোতেও দ্বিধা। মাখনবাবু জানালেন অন্য রাজবন্দীরা কি ভাবে ফাঁসির সময় বাঁধা বা অসুবিধার সৃষ্টি করতেন এবং শহীদদের মনোবল বাড়াতেন। কারাগারের ভিতরে শ্লোগানই ছিল শেষ সহায়। কারাগারের মাঝে এক জায়গায় একটা সানবাঁধানো উঠোন আছ। উঠোনের চারদিকে আট ইঞ্চি উঁচু ছোট্ট দেওয়াল। লোকেন্দ্রবাবু বললেন "ওটা উঠোন নয়। ওখানেই পা ভেজানো জলে বাটি দিয়ে আমাদের স্নান করতে হত। মাসের পর মাস তাই করেছি।" নেতাজী যে ঘরে বন্দী ছিলেন সে ঘরটা সে দিন সুন্দর করে সাজানো ছিল। এখানেও আমাদের দরকারবাবুদের ফটো তোলার এ্যালার্জী। যে ফটো তুলে পাছে নেতা ও শহীদদের স্মৃতি সাধারণ মানুষের মনে রেখাপাত করে তার জন্য একটা অহেতুক ভয়। পুরনো বন্দীরা তাদের অভিজ্ঞতার কথা সঙ্গে সঙ্গে বলে যাচ্ছিলেন। "দেখ এ রকম শব্দ কোরে আমরা এক সেল থেকে অন্য সেল-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতাম। মনে আছে এখানে এসে আমাদের বক্তৃতা শুনতে হত।" "এখান দিয়ে ভিজিটার, দর্শনার্থীরা আসতেন।" "এইখানেই তো সেই ইনফরমারকে হত্যা করার পর পুলিশের সঙ্গে টেররিস্টদের যুদ্ধ হল। এই সেই নর্দমা।..."

আরও কত কি। সুভাষচন্দ্রের মূর্তিতে মালা এবং শহীদ স্তম্ভে পুষ্পস্তবক দেওয়ার ভার ছিল নিরঞ্জনদা ও বিরজাবাবুর। তারপরে আরও অনুষ্ঠান ছিল জেলের ভিতরে ও বাইরে। বড় মামীমাই বোধ হয় জিজ্ঞেস করেছিলেন "তারকেশ্বর সেনগুপ্তের কথা কোথাও দেখেছিলে? উনি তো তোমার দাদুর ভাই। সেই বরিশাল থেকে এসে গুলিতে মরেছিলেন মেদিনীপুরের হিজলী জেল-এ ১৯৩১ সালে।" ...মনে মনে ভেবেছিলাম যে এই হিজলীতেই তো ছিলাম ক'বছর, এবং ওই জেল-এ তো গেছি, তখন অবশ্য তারকেশ্বর সেনগুপ্তর খোঁজ করিনি। দোষটা আমারই। অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস। এর বছর কুড়ির মধ্যেই "দেশ ত্যাগের পরে দাদুর মেয়ে তাদের শিশু পুত্র কন্যাকে আগলে সেই বরিশাল থেকেই পালালেন মেদিনীপুরে। হিজলীর পাশেই বলা চলে। এবারে প্রাণ দিতে নয়, প্রাণ বাঁচাতে। উনি প্রাণ হারালেন স্বেচ্ছা মৃত্যুতে, আর এখানে প্রাণ হারাল দাদুর মেয়ে অপমৃত্যুতে।" কোন এক আত্মীয়া মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

ঘুরতে ঘুরতে দেখানোবাবু পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, ঢাকা, ও চট্টগ্রামের কথা মনে করে দিয়েছিলেন। ১৯৩৪-এর চট্টগ্রাম বিপ্লবে সম্মুখ সমরের পরে জেলে ঘাতকের হাতে প্রাণ দেন বেশ কয়েকজন। তার মধ্যে ছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার, হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ চৌধুরী। একজন জিজ্ঞাসা করছিলেন, "দস্তিদারবাবু, তারকেশ্বর দস্তিদার আপনাদের আত্মীয়?" আত্মীয় হলেও হতে পারে। আমাদের ছেলে মেয়েদের মনেও সেই প্রশ্ন জেগেছিল। এখনও জাতপাত-ধর্ম-বর্ণ-জেলাওয়ারী সংকীর্ণতা মাথায় ঢোকার সুযোগ হয় নি। এক দাদুর পদবী সেনগুপ্ত ও অন্যজনের দস্তিদার জেনে, শহীদ স্মৃতির বই পড়ে নিজেরাই ঠিক করেছিল দেশ ও দুই তারকেশ্বর-এর স্মৃতিরক্ষার্থে আমাদের পুত্র শুভর নাম হতে পারত শুভ তারকেশ্বর সেনগুপ্ত দস্তিদার। চলতি সংজ্ঞায় শুভর দেশ তো এ্যালাবামা। কিন্তু নূতন প্রজন্মের কাছে পৃথিবীটা অনেক ছোট তাই সংজ্ঞাগুলোও পালটাতে হচ্ছে। যেমন শহীদরা পালটে দিয়ে গেছেন মৃত্যুর সংজ্ঞা। ১৯৭২ সালে উত্তর প্রদেশে কারাগারে প্রাণ দেবার আগে শ্রীরামপ্রসাদ বিসমিল গেয়ে গেছেন :

প্রাণে জেগেছে স্পন্দন।
কেমনে আমি মৃত্যুর সঙ্গে করিব করমর্দন!
এবং দেখব কত জোর আছে
ওই জহ্লাদের হাতে!

ক্যালকাটা ক্লাব

কলকাতায় পৌঁছনোর পর থেকেই আমরা দুজনে ফোনে লুকোচুরি খেলে যাচ্ছিলাম। কলকাতার ফোন এত ভাল কাজ করছে তা দেখে মনে মনে বলেছিলাম "হরি বোল, হরি বোল"। হয়ত উঠ্‌তি কলকাতার মত বলা উচিৎ ছিল, "ব্রাভো, ব্রাভো"। কিন্তু একেবারে "ভেতো" যে। যাই হোক, অবশেষে একদিন রাত করেই ধরা পড়লাম। ও দিক থেকে একজন বললেন, "আমি অমুক বলছি। কি যে আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি...।" আরও অনেক কথার পর ডঃ আফতাব আমাকে "ক্যালকাটা ক্লাবে" নিমন্ত্রণ জানালেন, যা নামে জানলেও, জীবনে কোনদিন যাইনি। কলকাতায় বড় হলেও এ ব্যাপারে আগেও আগ্রহ ছিল না, এখনও নেই। তবে ইস্‌কুল কলেজে যখন পড়েছি তখন কেউ কেউ বলেছে এটা বড়লোকের আড্ডাখানা। তাতেও আমার উৎসাহ ছিল না। কালোরাও নাকি অনেকদিন ঢুকতে পেত না। ছোটবেলায় আর পাঁচটা নিম্নবিত্ত ও উদ্বাস্তু পরিবারের মত মা-বাবার ধনীদের সঙ্গে পাল্লা দেবার সামর্থ্য ছিল না। ইচ্ছেও ছিল না। ভেবে পাচ্ছিলাম না উনি কেন আমাকে একটা ক্লাবে ডাকলেন। কলকাতার লোকেরা, বিশেষতঃ বাঙালীরা, আলাপের জন্য বাড়িতে ডাকেন। এটাই রীতি, কখনও সখনও অফিসে। ক্লাবে বা রেস্টুরেন্টে আলাপের নিমন্ত্রণ খুব বড় একটা পাই নি, যেমন পেয়েছি আমেরিকায়, ইউরোপে বা বাংলাদেশে ও পাকিস্তানে। মনে মনে ভাবলাম আমেরিকা থেকে কলকাতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে যে "ক্যালকাটা ৩০০" বই বেরচ্ছে তার ওপর আলোচনা হবে সেই জন্যেই হয়ত ছুঁতো খুঁজে বা সিম্‌বলিক্যালি ওই ক্লাব বেছে নিয়েছেন, যদিও আফতাবদার স্ত্রী কল্পনাবৌদির রান্না খেয়েছি কয়েকবার। বলে দিলেন, "মনে আছে তো কোথায়? ওই ইনফরমেশন সেন্টারের উল্টো দিকে"।

আফতাববাবুর সঙ্গে কথা বলার ক'দিনের মধ্যেই ছিল বইমেলার জন্য পদযাত্রা। আমার অন্য দেশে, বিশেষত নিউইয়র্কে রোজই কিছু না কিছু পদযাত্রা হচ্ছে। মানে ডিমনস্ট্রেশন। আমি বাংলাদেশেও একুশের মিছিলে সামিল হয়েছি। তা তো ভোলবার নয়। আর কলকাতারও অনেক মিছিলে যোগ দিয়েছি। কলকাতার আরেক নাম তো মিছিলনগরী। দেখলাম পাড়া থেকেই শুরু হয়েছে তাই মেজদির বাড়ির নিমন্ত্রণ বাতিল করে যোগ দিলাম পদযাত্রায়।

দেশপ্রিয় পার্কে তখন লাইন জমা হচ্ছে। মেদিনীপুরের জানাবাবু ও পুরুলিয়ার স্কুল মাস্টার ব্যানার্জীবাবুর সঙ্গে আলাপ জমিয়েছি। হঠাৎ পিঠে কে যেন টোকা মারল। "আপনিই অমুক?" বললাম "খাঁটি সত্যি"।

"কাল রাত থেকেই মনে হচ্ছিল আপনি আসতে পারেন, এবং মনে মনে একটা ইমেজও তৈরি করেছিলাম। আমি অমুক আফতাব বলে দুহাত জোড় করে নমস্কার জানালেন।

আমিও মনে মনে বলেছিলাম, "এ ব্যাটা নিশ্চয়ই ম্যাজিসিয়ান"। ভালই লেগেছিল এ ঘটনায়।

"আপনি মশাই ভগবানে বিশ্বাস এনে দিচ্ছেন," হেসে বললাম।

জানাবাবু জানালেন, "অঘটন আজও ঘটে"।

অনেকদিন পর কলকাতায় মিছিল করে মজা পেয়েছিলাম বৈ কি। একটু ব্যতিক্রমধর্মী। আগে যখন কিছু চলছিল না, মিছিলে বড় গলায় বলতাম। "[এ রকমই] চলছে, চলবে"। এখন বলছিলাম, "বই পড়ুন, বই পড়ান," "আরও বই চাই," এবং ইংরেজীতে "রিড মোর বুক্স"। খারাপও লেগেছিল, এক কোটি লোকের শহরে এই এক মুঠো লোক, আর আধ মুঠো শিশু। একটি শিশুর হাতে মজার এক ফেস্টুন দেখে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা তুমি লিখেছ?"

"না কাকু" ছেলেটি জানাল, "দিদিমণি লিখে দিয়েছে। আমি কি ইংরেজী জানি? মা বলেছে ক্লাস সিক্স-এ উঠলে ইংরেজী শিখব"।

ক'দিন পরে পরিকল্পনা মত আমি গেলাম ক্যালকাটা ক্লাবে। একটু ভয়ও পেয়েছিলাম, "ঢুকতে দেবে তো?" কিন্তু কালো লোক দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলাম—তবে তারা সুটেড-বুটেড। ভয়ে মেইন গেট থেকে প্রায় ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ি। সময়ের কিছু আগেই। ডঃ আফতাব তখনও আসেন নি। ওনাকে না দেখে আমি একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ি। ক্লাব তখন একেবারে ফাঁকা। একে কাজের দিন, তার ওপর কাজের সময়। লন-এর দিকে এক টেবিলে এক বয়স্কা মহিলা মনে হল কি যেন চিন্তা করছেন ও স্মোক করে চলেছেন। আরেক টেবিলে দুই পুরুষ ও দুই মহিলা চা খাচ্ছেন। বাঙালী মহিলার টাইট ব্লু জীন, বিদেশিনীর শাড়ি। ভদ্রলোক দুজনেই থ্রি পীস স্যুট পরে ঘেমে যাচ্ছেন। অন্য এক মহিলা পরেছেন প্যান্ট-পানজাবি। দু-চারজনের মধ্যে একজন মাত্র ধুতি পরে, আর নির্ভুল বরিশ্যাইল্যা বলে যাচ্ছেন। শুনে হোমসিক হয়ে পড়েছিলাম। কর্মীদের সবাই সাদা উর্দি পরে, একজন সাদা পানজাবি পরেছেন।

কিছু পরে হঠাৎ খেয়াল করলাম উর্দি পরা এক লোক পাশে দাঁড়িয়ে। ডঃ আফতাব তখনও আসেনি বলে একটা বই পড়ছিলাম। মনে হল উনি হয়তো কিছু বলবেন।

"কিছু বলবেন?" জিজ্ঞাসা করলাম। লোকটি একটু আগে বরিশালবাবুর সঙ্গে চেয়ার সাজাচ্ছিলেন। মনে হল অন্য বেয়ারাদের চোখও আমাদের দিকে।

"কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন?" বেয়ারাবাবু জিজ্ঞাসা করে ফেললেন।

"হ্যাঁ। একটু আগে এসে গেছি। ডঃ অমুক আফতাবের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ততক্ষণে পানজাবিপরা সহকর্মীটি এসে গেছেন।"

"আফতাববাবুকে চেনেন? বাঙালী?" সহকর্মী বেয়ারাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ অবশ্যই খাঁটি বাঙালী" বলেই পড়ায় মন দিলাম আবার। কিন্তু কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল আছে মনে হল। ওদের একজন অন্যজনকে ফিস্ ফিস্ করে বলল, "বল্, বল্। না হলে উঠবে না।"

"এখানে বসাটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু"। আমাকে উদ্দেশ্য করে বেয়ারাবাবু বলেই ফেললেন। "আপনাকে ঝামেলা করতে পারে।"

"ঠিক বুঝলাম না," বললাম।

ভদ্রলোক খুব তাড়াতাড়ি কথাগুলো আবার বললেন, "এই পোষাকে এখানে আসা যায় না। তাড়াতাড়ি বাইরে চলে যান।"

'মানে?" তখনও আমার বোধগম্য হয় নি।

"এটা তো সাহেবদের জায়গা তাই এই পোষাকে এখানে আসা যায় না। ম্যানেজার দেখলে বকাবকি করতে পারে। প্যান্ট আর পানজাবির নিয়ম নেই এখানে, আপনাকে বাইরে যেতে হবে।"

"ওই মহিলা তো ওখানে এই পোষাকে এসেছেন।"

"উনি তো মেমসাহেব। তাছাড়া আপনার জুতো?"

"এটা আর খারাপ কি? এটা তো ঝক্‌ঝক্ করছে"। ওটা দেখিয়ে বললাম। "আপনিও তো এই রকম পরেছেন," সহকর্মীবাবুকে বললাম।

"আমরা তো সাধারণ মানুষ। এখানে কাজ করি।"

"আমাকেও তাই মনে করুন, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমার কাজ শেষ না হলে তো আমি যাব না। সে আপনারা যাই বলুন। এই এখানেই বসে আছি।" কলকাতায় শেখা ধর্নার শ্লোগান ছাড়লাম। "আপনারা বড়বাবুকে বলতে পারেন"।

এর মাঝেই একজন বলে গেলেন, "বেশ করেছেন। কিছুতেই নড়বেন না।" বরিশালবাবু নিজের ধুতি দেখিয়ে চলে গেলেন। "শালারা তো আগে ধুতি পরেও ঢুকতে দিত না।" হিন্দী টানে একজন বললেন, "অনেক সাহেব কত বিচ্ছিরী পোষাকে ঢোকে, তখন? আপনি তো খুব ভাল পরেছেন।" আরও কত চুটকি। একজন তো বলেই ফেললেন, "দাদা, চা খাবেন?" বেয়ারাবাবু ইতিমধ্যে বড়বাবুর সন্ধানে চলে গেছেন বোধহয়। আমার নতুন বন্ধুদের সহানুভূতি ও সমালোচনা শুনতে শুনতে ডঃ আফতাব এসে হাজির হলেন। আমি দাঁড়িয়ে ওনাকে নমস্কার জানাতে উনি আমার আপাদমস্তক দেখে প্রশ্ন করলেন, "সব ঠিক আছে তো?" কথাটা কানে লেগেছিল।

"অবশ্যই"। অনেক কাজের কথা হওয়ার পর দাদাকে আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম।

"ঢুকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তাই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সব ঠিক আছে কিনা'। আমার জামাই বিষ্ণুকে এরা একবার হেনস্তা করেছিল। এ জায়গাটা আমার পোষায় না। আমার বন্ধু অভিজিৎ আর আমি অনেকটা জেদের বশেই এটার মেমবার হয়েছি। আমি জানি যে আপনার সাহেবের দেশের লোকেরা সাহেবী বলতে যা বোঝায় তার এন্টিথিসিস।..." কিছু পরে এক ছোটবাবু খবর নিতে এলে আফতাববাবু উঁচুগলায় ওনাদের বোঝাতে লাগলেন, "এই তো উনি এই পোষাকে আট-দশটা দেশ ঘুরে এলেন। কোথাও তো কেউ বাধা দেয়নি। এই পোষাকে উনি ওনার সাহেবদের দেশেও সব জায়গায় যান। কোথাও তো কোন ঝামেলা হয় না"।

"...না, না, সেটা ঠিক নয়। এই কলকাতা বাদে আরেক জায়গায় আমাকে যেতে দেয় নি সেটাও মার্কসবাদী রুমেনিয়ার বুকারেস্টের হিল্টন হোটেলে"। ওনার কথার মাঝেই বলে ফেললাম। তবে জিজ্ঞেস করছিল, "ইণ্ডিয়া? ইণ্ডিয়া?" দলের একজনকে আমেরিকান পাসপোর্ট দেখাতেই ডোরম্যান ছুটে গিয়ে কোন এক বড় সাহেবকে ডেকে এনে আমাদের দেখিয়ে বলে, "আমেরিকা, আমেরিকা। ওদের কাছে ডলার আছে"।

ক্যালকাটা ক্লাবের ছোটবাবু বিনীত কণ্ঠে বললেন, "উনি তো সাহেবের দেশের সেটা বলেন নি। ওনাকে তো কলকাতার বাঙালী ভেবেছি। গেস্ট বুকে নাম দেখে ভেবেছিলাম উনি এখানকার মানুষ।

কথা বেশীদূর গড়াবার আগেই দেখি গরম গরম চা আর পেঁয়াজী হাজির। নতুন বন্ধুরাই ওগুলো নিয়ে এসেছেন!

রামমোহনপুর

শ্যামলদা যথারীতি চিঠিতে লিখে দিয়েছিল, "স্টেশনে নেমে সোজা সদর রাস্তায় যাবে। সেখানে বাঁদিকে কিছুদূর গেলেই পাবে বাসস্টপ। বাসে ৪০/৫০ মিনিট লাগবে। রাধাগোবিন্দপুর পেরলেই আমাদের রামমোহনপুর। সেখানে বাস স্টপে নেমে আমার কথা জিজ্ঞেস করলেই কেউ না কেউ পথ দেখিয়ে দিতে পারবে।" প্রত্যেকবারই সেই একই কথা লেখে, আর প্রত্যেকবারই আমরা হাতে ওই চিরকুট নিয়েই রওয়ানা হই। ওটাই আমাদের অন্ধের লাঠি, ভবঘুরের পুঁটলি, আর উদ্বাস্তুর প্যাঁটরা।

রামমোহনপুরের বাসস্টপটা আর পাঁচটা গ্রামের বাসস্টপের মতই, তবে এটা কলকাতার খুব কাছেও নয়, খুব দূরেও নয়। এখানকার পরেই একটা বাস রুট শেষ হয় দামোদর নদের পশ্চিমতীরে গাড়োলে। অন্য বাসরুট শেষ হয় কয়েকমাইল পর নুরপুরে। বাংলাদেশের সব গ্রামের বাসস্টপই বেশ ঘিঞ্জি হয়। দোকানদাররা তাদের দোকান এগোতে এগোতে রাস্তায় পীচ দেওয়া জায়গাতে চলে আসে। এখানেও তাই। এখানেও একটা বড় বটগাছ আছে যার চারদিক ঘিরে আছে সাইকেল, রিক্সা, ঠেলা, ঘোড়ার গাড়ি, ও দু-একটা "সারা-বাংলা" তিনচাকার টেম্পো। বটগাছের দৌলতে এখনও শিবঠাকুরের নামে পাথর পড়ে নি, তবে শীতলা মা আছেন অবশ্য। আর আছে শাক, সব্জী, ফল, পান-বিড়ি, মিষ্টি, সাইকেল মেরামত, বিদ্যুৎ সরঞ্জাম, বাসনপত্র এমনকি একটা মাংসের দোকানও। আমাদের বাংলাদেশের গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভাল হলেও মানুষ থাকে অপরিচ্ছন্ন ভাবে। তাই প্রত্যেক দোকানদার দিনে বার কয়েক তাদের দোকানের সামনেটা ঝাঁট দিয়ে ময়লা ঠেলে দেন ওই বটগাছেরই সামনে বা রাস্তায় মাঝখানে। ভাগ্যিস ছাড়া গরু, ছাগল, মুরগী, কুকুর আছে অনেক, এবং আছে কাকও। এদের কল্যাণেই বাস স্টপ-এ দাঁড়ানো যায়, এটা একেবারে ন্যাচারাল রিসাইক্লিং।

কলকাতা থেকে ড্যাংচিবাবু এসেছেন তা বুঝতে কারুর বাকি নেই। তিনজনেরই রয়েছে ব্যাকপ্যাক ও হাতের ঝোলানো ব্যাগে পাসপোর্ট। ভাগ্যিস সঙ্গে ও ছিল শাড়ি পরে। যাইহোক বাস থেকে নেমে ছানা-পোনা ও গিন্নীর সঙ্গে পরের স্টেপ-এর জন্য কনফারেন্স করার আগেই একটি লোক একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করল,

"যাবেন?"

"নিশ্চয়ই," উত্তর দিলাম।

"কার বাড়ি?" সেই রোগা, পাতলা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ময়লা শার্ট ও ধুতি পরা লোকটি জিজ্ঞাসা করল। শ্যামলদার নাম বললাম। "বাজারের কাছেই" বললাম "উনি রাধাগোবিন্দ স্কুলে পড়ান তো?"

"হ্যাঁ।" এর মধ্যেই অবশ্য গুটি গুটি করে আরও লোক জড়ো হতে শুরু করেছে। আর ওদিকে শুভ ও জয়িতা রোগা, আবর্জনার মধ্য থেকে খাদ্য খাওয়া-রত ছাড়া পেটমোটা গরু দুটোর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। তাছাড়া রয়েছে ছাগল, মুরগী, ও কুকুর। একটা কুইনস্ ফার্মের মধ্যে এসে পড়েছি যেন।

"ওনার স্ত্রী তো মেয়েদের স্কুলে পড়ান। তাই না?" অন্য একজন জিজ্ঞাসা করলেন।

বললাম, "হ্যাঁ।"

ভদ্রলোক একটা বড় দম ফেলে বললেন, "কোন চিন্তা নেই। এখুনি পৌঁছে দিচ্ছি"। বলেই ডাক ছাড়লেন, "রফিক, এদের তোর মাস্টারের বাড়ি পৌঁছে দে"। আমাদের দিকে জোড় হাত করে বললেন, "নমস্কার, ওনাকে বলবেন, আমার নাম নিতাই। উনি আমাকে চেনেন।"

"কেন আপনি যাবেন না?"

"মাস্টারমশাই হচ্ছে রফিকের লোক। আমার রিক্সায় আপনারা গেলে খুব মুশকিল!" বলেই নির্লিপ্তভাবে নিতাইবাবু রফিকের সাইকেল রিক্সার দিকে পথ দেখালেন।

ওদিকে রফিকবাবু তার কোন এক বন্ধুর সাইকেল-ঠেলার ওপর বসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন ও বিড়ি ফুঁকছিলেন। ডাক শুনেই বিড়ি ফেলে তড়াক করে নেমে এল। বিড়ির ধোঁয়ার গন্ধ যেন না পাই তাই হাত দিয়ে মুখের ধোঁয়া তাড়াতে তাড়াতে এলেন।

"এই এদের মাস্টার মশাইয়ের বাড়ি পৌঁছে দে। বাড়ি পর্যন্ত তুলে দিবি কিন্তু"। আদেশ দিলেন নিতাইবাবু। রফিকবাবু ঠিক কি ভাবে আমাদের আপ্যায়ন করবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। আমার ভয় হচ্ছিল যে শেষমেষ এই বাজারের মধ্যেই হয়ত পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবেন। অনেকটা বেঁকে জানালেন, "নমস্কার। মাস্টারমশাই আমাকে বলে রেখেছিলেন আপনারা আসতে পারেন।" শেফালীকে দেখিয়ে বলে, "আপনি তো বৌদিদিদের আত্মীয়া, বাইরে থাকেন। তাই না? বাসে কষ্ট-হয়নি তো?" জামাই আদর তখনই শুরু।

"আচ্ছা বলুন কত ভাড়া?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। রফিক মা কালীর মত জিভটা বার করে দিল। তবুও বললাম, "কত বলুন তা না হলে আপনার রিক্সায় যাব না"। দেশে আমি দরদস্তুর করে তবে উঠি। না হলে পৌঁছে ঝামেলা পোহাতে হয়েছে এক টাকার জন্য।

আপনি তো আমার লোক, অন্য কেউ আপনাদের নেবে না। এই শেতলা মা'র দিব্যি দিয়ে বলছি, নিজের লোকদের দর বলতে নেই। মাস্টারমশাই শুনলে কি বলবেন? যা মনে হয় তাই দেবেন। আমার বাড়ির লোকেরা গাল দেবে। এ হয় না। নিতাইবাবু ও অন্য অনেকে ভরসা দিয়ে বললেন, "উঠে পড়ুন"। বাড়ি যাওয়ার পথে রফিক জানিয়ে দিলেন যে পরীক্ষার সময় মাস্টারমশাই নিখরচায় তার ছেলেকে পড়িয়েছেন। মেয়ে তাহমিনা আমাদের ছোড়দিব স্কুলে পড়েছে। মেয়ের বিয়ের সময় পনের হাজার টাকার মধ্যে অনেকটাই যোগান দিয়েছেন শ্যামলদা ও ছোড়দি। "ওনারা তো আমার আত্মীয়ের মত। আমাদের বিয়েতে বামুনপুরুত আসে না। তবে আমি মাস্টারমশাইকে এনেছিলাম। বামুন তো, তাই মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ না করলে বিয়ে কি হয়? বৌদিদি তো প্রায় মেয়ের মায়ের মতই। জামাই আসাদকে ওদের খুব পছন্দ।"

ছোড়দির বাড়িতে যেতে গেলে শেষটুকু পায়ে হেঁটে না গেলে উপায় নেই। বাজারে নেমে,

"স্বামী বালানন্দ জগত্তারিণী উচ্চ বিদ্যালয়"-কে বাঁয়ে রেখে, নর্দমার পাশ দিয়ে পুকুর বাঁচিয়ে যেতে হয়। আমাদের ব্যাকপ্যাকগুলো জোর করে হাত থেকে নিয়ে রফিকবাবু ছোড়দির বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই দৌড়। পাছে ওনাকে আমি টাকা দিতে চাই। চেঁচিয়ে বলে গেলেন, "বিকেলে পেঁয়াজী নিয়ে আসব বৌদি।"

ছোড়দির বাড়িটা দোচালা মাটির বাড়ি। উঠোনের ডানপাশে রান্নাঘর, বাঁদিকে টেপা-কল (টিউবওয়েল) আর বাঁয়ে পেছনে পায়খানা। বিজলির আলো নেই বটে, তবে ব্যাটারী-চালিত টেলিভিশন আছে ঠিকই। উঠোনের লোকের হাঁটা-চলা কমলেই এক পাখিদম্পতি চুপি চুপি এসে ভাত-ডালের ছিঁটেফোঁটা খেয়েই পালাত। আর সারাদিন বেড়ার ওপাশে কুহু কুহু ডাকত। প্রেমালাপ ও বন্ধুবান্ধব-এর খোঁজে বোধহয়। এবারে দেখি একটা ডাহুক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাদা-কালো বুকের কাছে সাদা ছোপ। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়ত বা একজন ঘর সামলাচ্ছে বা ডিমে তা দিচ্ছে। পরে জানলাম অল্প কিছুদিন আগে কয়েকজন শিকারী সাঁওতালের রাতের ভোজ হয়েছে ডাহুকদম্পতির একজন।

দেশের গ্রামে নতুন কেউ এলেই খবর ছড়িয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। বড়দের তো আড্ডা দিলেই চলে, তবে মুসকিল হয় ছোটদেরই। আমাদের ছেলেমেয়েদের শুধু রক্ষে চারদিকে ছাগল ও ছাগলছানা, বাছুর দেখতে পাওয়া যায় বলে। ছোটরা ওদের পেছনে ছুটে দিন কাবার করতে পারে।

পরের দিন দুপুরে ঘর থেকে বেরিয়ে বাজারের মুখে পড়তেই শ্যামলদা দুই ভদ্রলোককে বলেন, "এই যে এদের কথাই বলেছিলাম। উনিও মাস্টার তাই আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে চায়।" আমাদের দিকে ফিরে বলেন, "ইনি হচ্ছেন স্বামী বালানন্দের হেডমাস্টার আলতাফ হোসেন, আর ইনি হচ্ছেন এ্যাসিট্যান্ট হেডমাস্টার নলিনী দত্ত"। বললাম, "একটু ইস্‌কুলের কথা শোনা যাক। ছেলেমেয়েরা তো ছাগলের সন্ধান পেয়ে গেছে, অসুবিধা হবে না।"

দুজনেই হাত ও মাথা নেড়ে, জোর গলায় বলে, "তা কি কখন হয়? এই ছোটলোকের মত প্যান্ট-শার্ট পরে আছি।

"মানে?"

"পরশু বিকেল তিনটের সময় বসব। অনিন্দ্যবাবু ও সুমিত্রাদেবীকেও আসতে বলব। চা মুড়ি না হলে চলে? ওনারাও আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আমরা ভদ্র মত ধুতি পাঞ্জাবী পরে আসব"—হেডমাস্টারবাবু জানালেন। মনে মনে ভাবলাম "ব্লু জীন ছেড়ে এখন ধুতি-পাঞ্জাবি পাই কোথায়।"

পরের দিন সকালে ডাক পড়েছিল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুশীলবাবুর বাড়িতে। এটা এখন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির শক্ত ঘাঁটি। সুশীলবাবুও সিপিএম-এর বড় চাঁই। কথা ছিল সরাসরি ওনার বাড়িতে যাব, শ্যামলদাও ওখানে আসবে। একটু হাঁটা দিয়ে রাস্তার পাশের এক সবজীওয়ালাকে জিগ্যেস করি, "পঞ্চায়েত প্রধান সুশীলবাবুর বাড়িটা জানেন?"

"ওই তো ওদিক দিয়ে গিয়ে কিছুটা হাঁটলেই দেখবেন সবচেয়ে বড় বাড়িটা। "ওটা ওনার বাড়ি" বলে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন রাস্তাটা, মনটা খচ করে উঠল। কমুনিস্ট পার্টির প্রধান,

তার পরিচয় "সবচেয়ে বড় বাড়ি?" একটু এগিয়ে দেখি এক মহিলা ছাগল তাড়াচ্ছেন। জিগেস করি "ও দিদি, প্রধান-এর বাড়িটা জানেন?"

"ওই তো ডান দিকে মোড় নিয়ে বাঁ হাতের রাস্তা ধরে "সবচেয়ে বড় বাড়ি"। নতুন রং করেছে। লোহার দরজা আছে।

"না, না উনি বোধ হয় নন। শুনেছি উনি তো সিপিএম-এর খুব ভাল লোক।"

"হ্যাঁ গো, হাঁ, সে-ই। প্রধান হবার পরই বাড়ি বড় করেছে।" ভাবলাম, "যেই যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ"।

সুশীলবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই অনেক কথা বললেন। খুবই ভদ্র, নম্র, অমায়িক। ওঠার আগে যখন ফটো নিচ্ছি তখন সুশীলবাবু জানালেন "...আপনি তো অবশ্যই বরিশালের। আপনার পদবী থেকেই বোঝা যায়। আমিও বরিশালের। বাবার সঙ্গে এখানে এসে বসত করেছি।" গর্বে যেন বুকটা ফুলে গেল ওনার। বললেন, "ছোটবেলায় কষ্টে কেটেছে।" "এখানে বরাবরই নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছি।...শুনলাম দেশে যাওয়ার পথে এখানে এসেছেন। সেখানে নাকি পাকাপাকি থাকার প্ল্যান করছেন। আসুন না এখানেই না হয় বসত করুন, আর না হয় আমাকেও দেশে নিয়ে চলুন। দেশের জন্য এখনও মনটা কাঁদে...।"

বলেছিলাম, "আসুন না"।

সুশীলবাবুর সঙ্গে দেখা সেরে গিয়েছিলাম দূরে শ্যামলদার রাধাগোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিমন্ত্রণ রাখতে। উনিও মার্কসবাদী জানতাম, তাই ভেবেছিলাম কথা হবে হয়ত মার্কস, এঞ্জেলস, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, কিংবা সোভিয়েত-চীনের সমাজতান্ত্রিক সাফল্য। তখনও সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয় নি। চীনের তিয়েন-এন-মান-এর গণহত্যার কথাও বাম পত্রিকা যথাসাধ্য এড়িয়ে গেছে। হেডমাস্টার পূর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু প্রাথমিক সৌজন্যের পরই সরাসরি বললেন, "আমেরিকার কথা বলুন। আমার খুব শখ সে দেশটা জানার জন্য"। পূর্ণবাবু মাঝবয়সী মানুষ, স্কুলের সঙ্গেই তার থাকায় জায়গা। গল্প শুরু হতেই স্কুল থেকে ডাক এল জরুরী ফোন এসেছে বলে। ওদিকে ওনার মেয়ে মালতী ও আরও কিছু ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে গেছে পেছনের নালা থেকে কুঁচো মাছ ধরবে বলে এবং বাঙালী শিশুর বিদেশী ইংরেজী শোনার জন্য।

পূর্ণবাবুর অবর্তমানে ওনার বসার ঘরে প্রথমেই চোখে পড়ল দিগন্ত ছোঁয়া গাছহীন তৃণভূমিতে এক দঙ্গল বুনো ঘোড়ার দৌড়োনোর ছবি। কাছে গিয়ে দেখি আমেরিকার পশ্চিমের প্রায়াবীর (Prairie) ছবি। আশ্চর্য হয়েছিলাম। তবে পরে জেনেছিলাম যে ওটা ওনার খুবই প্রিয় ছবি। সারা ঘরে আর মাত্র একটাই ফ্রেম ছিল, উল্টোদিকের দেওয়ালে। একটা লেখা বাঁধানো। কাছে গিয়ে দেখি সেও আমার আরেক দেশের। আমারই পাড়ায় বলা যায়। লং আয়ল্যাণ্ড-এর হারমান মেলভীল। ১৮৪০-এ প্রায়ার সৌন্দর্য্য ও সম্ভার-এর ওপর লেখা। চারটি প্যারা :

TROPHIES OF PEACE
ILLINOIS IN 1840
Files on files of Prairie Maize

On hosts of spears the morning plays!
Aloft the rustling stremers show :·
The floss embrowned is rich below,
... ...

পড়তে পড়তেই পূর্ণবাবু এসে গিয়েছিলেন। "পড়লেন আমার দাড়িওয়ালা আরেক গুরুদেবের কবিতা। আমি একটা তর্জমা করেছি শুনবেন?" বলেই শুরু করলেন,

শান্তির জয়মালা

"দিগন্তহীন প্রায়ারীর সারি সারি মকাই ঃ
উষা রশ্মি নেচে যায় মাথায় মাথায়।
আকাশের পানে চেয়ে মনে মনে ভাবে :
নীচে আছে খাঁটি মাটি যেন রেশমের গুটি।

... ...
"যেন সব স্মৃতি স্তম্ভ; কেবলই সেই স্তম্ভ।
সে দিগ্‌প্রসারী প্রায়ারী। উপ্‌চে পড়া ফসল,
তাও আছে অশ্বারোহী। রণদেবতার বিদ্রূপ-মেশা হাসি
তবু ঋতুদেবীর যশমান রটে মাঠ-ময়দান-চারণভূমি।"

দেশ থেকে দেশে

দেশ থেকে দেশে যাওয়ার কিছুদিন আগে ছেলেমেয়ের জন্মগত দেশ এ্যালাবামায় গিয়েছিলাম। সেখান থেকে এখন অনেক দূরে থাকি। গেলেই কিছু না কিছু কেনাই হয়, বিশেষতঃ কে-মার্ট সুপারমার্কেটে। ওটা আমার স্ত্রীর প্রিয়, এবং আমাদের এই 'বড় আপেল' নগরীতে ওই সুপারমার্কেট না থাকায় তার বেশ খেদ। অনেক কিছুই কেনা হয়েছিল, তারমধ্যে একটা বেশ দামী জিনিষ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফেরৎ দেওয়া হয়।

একটা যে অঘটন ঘটে গেছে বুঝতে ক'দিন লেগেছিল। হয়ত বা দেশ থেকে দেশে-এ যাওয়ার জন্য গোছগাছ করার সময়েই খোঁজ পাওয়া গেল যে দামী জিনিষটা ফেরৎ দেওয়া হলেও তার ফেরতটা ক্রেডিট হয়নি, সাদামাটা কথায় টাকাটা ফেরৎ দেয়নি। ভাবলাম হয়ত যাওয়ার আগে আসবে, তা এল না। অবশেষে একটা চিঠি ছেড়ে দিলাম, 'প্রিয় ম্যানেজারবাবু—। সঙ্গে প্রমাণস্বরূপ আমার ধারে কেনা, অর্থাৎ ক্রেডিট কার্ড-এর রসিদটাও পাঠিয়ে দিলাম, একটা কপি রেখে। ঠিকানা, জিপ (পোস্টাল) কোডও জানা ছিল না। সুপারমার্কেটটা মেমোরিয়াল হাইওয়েতে ছিল, তাই ওই রাস্তার নাম, শহরের নাম ও দক্ষিণের 'ডিক্সির প্রাণকেন্দ্র' রাজ্য এই নামেই ছেড়ে দিলাম। ব্যবসা-বাণিজ্যের যে সততা এদেশে বর্তমান তার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে চিঠিটা ছাড়লাম। একমাস-দেড়মাস পরে অনেক সময় রসিদ ছাড়াও জিনিষপত্র ফেরৎ নেয়। অনেক সময় কোন জিনিষ একদামে কিনে পরের সপ্তাহে 'সেল'-এ সেই জিনিষই যখন অর্ধেক দামে দেয়, অনেকে তখন আগের জিনিষ ফেরৎ দিয়ে, সেটাই পরে অর্ধেক দামে কেনে। এ তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। একবার আমি একটা ১৮ ফুট এ্যালুমিনিয়াম মই কিনি। বছরখানেক পরে বাড়ির রং করতে করতে বুঝলাম ওটা কেনা উচিত ছিল ২৪ ফুট বা ৩০ ফুট। কাঁচুমাচু মুখ করে সেলস্‌গার্লকে বললাম পুরো ব্যাপারটা। আরও বললাম যে কেনার রসিদও নেই, এছাড়া ওটার ওপর অন্তত কয়েকবার চড়েছি। মইটা দেখে মেয়েটি বলেছিল, "ওর জন্য অত চিন্তা কিসের?"

দেশের কলকাতা এয়ারপোর্টের অনেকে বদনাম করেন। কারণ নাকি বাঙালী, পশ্চিমবঙ্গীয় ও পূর্ব ও উত্তর ভারতের লোক বিদেশে তুলনামূলকভাবে অল্প থাকায় সেখানে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট কম থাকে, তাই সেখানে কাস্টমসের লোকেরা ঝামেলা করে আনন্দ পান। এটা ঠিক কলকাতা বিমানবন্দরের অলসতা দেখলে দুঃখ লাগে, কিন্তু অন্যের অভিযোগের কোন কারণ খুঁজে পাইনি আমি। এতবার এসেছি-গেছি এবারই মাত্র আমার স্যুটকেস নিয়ে টানাটানি করেছে। কোনদিনই কিছুর সন্ধান পায়নি কেউই। এর আগে যখন এসেছিলাম তখন আমি মুভি ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলাম, বলেছিলাম যে, ওটা পাসপোর্টে না লিখলে বাধিত হব, কারণ ওটা এদেশে ব্যবহার করা যাবে না, এছাড়া ক'দিন পরে যখন ক'দিনের জন্য এই এয়ারপোর্ট দিয়ে বাইরে বেড়াতে

যাব, তখন কিন্তু ওটা সঙ্গে নেব না, বন্ধুরা সবাই বলেছিল, 'দেখবি এয়ারপোর্টে ঠিকই ঝামেলা করবে।'

ট্যুরে যাওয়ার দিন ক্যামেরা ছাড়াই হাজির হয়েছিলাম। কারা যেন বলছিল, 'ওকে যেতে দিও না। ক্যামেরাটা বেচে দিয়েছে। ও ব্যাটা ঠিক ফিরবে না'। অফিসার মাইতি ও প্রামাণিক এগিয়ে এসেছিলেন সাহায্যের জন্য। নিয়ে গিয়েছিলেন বড়বাবু বনারসী দাসের কাছে। ওনারা দেখে-টেখে বলেছিলেন, 'ওনাকে দেখে চোর মনে হচ্ছেনা'। ক'দিন পরে যখন ফিরছি তখন ওনাদেরই একজন ডিউটিতে। বললাম, 'ব্যাগটা খুলব?' জীপারটা খুলব ঠিক করেছি।

ধমকে দিয়ে বললেন, 'আপনাকে কি খুলতে বলেছি?' ক'বছর আগেও ওই রকম খুলতে গিয়ে ধমক খেয়েছিলাম। লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। এবার আমার টার্ন। ওদিকে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের এ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছিল কিরণবালা দাস-এর জন্য। ডিব্রুগড়ের ফ্লাইট। বলছে ফ্লাইট আর মাত্র মিনিট কয়েক-এর মধ্যে ছাড়বে। দেখি পেছনের মহিলা, সঙ্গে বাচ্চা মেয়েটাকে বোধ হয় কেঁদে কেঁদে অহমিয়া ও ইংরেজী মিশিয়ে বলছেন, 'প্লেনটা ছেড়ে যাচ্ছে, একটা দিন এয়ারপোর্টে থাকতে হবে,' ইত্যাদি'।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনিই, কিরণবালা দাস?'

'হ্যাঁ'।

'আসুন আপনি আমার আগে যান, দেখুন যদি ফ্লাইট ধরতে পারেন'। কাস্টমস বাবুকে বললাম, দাস দেবীরটা আগে দেখতে। ওই ক'মিনিট দেরিতে আমার কিছু আসবে যাবে না। ভদ্রমহিলা আনন্দে বোধ হয় কাঁদতে বাকি ছিল। কাস্টমস বাবুও সেকেণ্ডের মধ্যে কিরণবালাদেবীকে ছেড়ে দিয়ে কাকে যেন বললেন, ওনাকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিতে। এরপর যথারীতি কাস্টমস বাবুর জন্য বাক্স খোলার তোড়জোড় করছি দেখে ভদ্রলোক ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'আপনাকে খুলতে বলেছি?'

দেশ থেকে দেশে এসেছি। কলকাতা থেকে ঢাকা। আগমন, 'এ্যারাইভাল'। এলাকা থেকে বেরিয়ে পোটলাগুলো গোছগাছ করছি, একটি যুবক এসে জিজ্ঞাসা করলা, 'আপনি ডঃ দস্তিদার?'

'হ্যাঁ'।

'আদাব, আমি আনন্দ। আমার বড়ভাই আশরাফ, আপনার মিঠুদা, গাড়ি পাঠিয়েছেন। উনি আসতে পারেন নাই। ভাবী কাজে গেছে।' আমার স্ত্রীকে দেখিয়ে বলল, 'বৌদি নমস্কার'।

আমরা গিয়ে উঠলাম। 'নগর হোটেলে'। এটা ওদের পাড়াতেই বলা যায়। যে ছেলেটি চেক-ইন কাউন্টারে ছিল, অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করার পর বলে : স্যার, আপনারে সবচেয়ে ভাল ঘরটা দিলাম। আমাদের হোটেলের খুব নাম, কিন্তু আপনি ভাবী ও ও বাচ্চাদের নিয়ে কোন আত্মীয়ের বাসায় উঠতে পারেননি?'

ভাবলাম 'এ কি রঙ্গ? যার হোটেলে উঠেছি তিনিই বকছেন তাঁর ওখানে ওঠার জন্য।'

'কেন?'

'দেখছেন না হিমালয় থেকে স্মাগলারে ভরে গেছে?'

দেখলাম সত্যিই হোটেলটাতে বিদেশী ভর্তি। ক'দিন পরে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে

কলকাতা যাওয়ার সময় দেখলাম এক একজন জামা, জুতো, সানগ্লাস (নীল চশমা) থেকে ক্যামেরা, দূরবীন, সবই নিয়ে চলেছে অন্য দেশে। পরে নাকি সেগুলো কলকাতায় আসবে।

নগর হোটেল থেকে দরকারী ফোনগুলো সেরে হাতমুখ ধুয়ে বেরবার মুখে হন্তদন্ত হয়ে আশরাফদা হাজির, আমাদের তার বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। আনন্দর নাকি আমাদের আশরাফদার বাড়িতেই নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। অনেক উৎসাহভরে গিয়ে ছিল 'প্রবাসী' পরিবার দেখতে। সে তার বৌদি নীলিমা আশরাফের কাছে আমার স্ত্রীর বিদেশে পড়া, বিদেশী ডক্টরেট, শুনে অনেক উৎসাহ পেলেও তার শাঁখা-সিঁদুর দেখে সরাসরি হোটেলে তুলছে। তাদের বাড়িতে থাকব কিনা ভেবে। আমাদের কথাবার্তা শুনে ম্যানেজারবাবু টাকা ফেরৎ দেবার অফারও দিয়েছিলেন। ভাবলাম এইতো আমার দেশ।

ফোন অনুযায়ী জনা দুয়েক-এর সঙ্গে দেখা করার পর সুজনের মামা বরিশালের রেজওয়ান আলী সাহেবের কাছে গেছি। রকেটের টিকিট কিনব, তার অফিসের গায়েই। আলীসাহেবের সঙ্গে এই প্রথম আলাপ। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'আপনার ভাগ্য ভাল টিকিট পেয়ে গেছি। একেবারে কেবিনের। আপনাকে একা ছাড়ব কি করে? আমিও যাচ্ছি সঙ্গে।' এত অতি উত্তম কিন্তু বাধ সাধল ভদ্রলোককে টিকেটের অতগুলো টাকার কথা বলতেই উনি এমন ভাব করছেন যে টাকার কথা বলাটাই যেন মহাপাপ। ক'দিন ঘোরার পর প্রকৃতপক্ষে জোর করেই ওনার পকেটে টাকাটা রেখে আসি।

সেবার ঢাকা থেকে বরিশাল-এর ঘাটে পৌঁছে ওই ভোর রাতেই খোঁজ নিয়েছিলাম ফেরার টিকিটের জন্য। না হলে মুশকিল ভাল জাহাজগুলোতে টিকিট পাওয়া। অফিসঘর বন্ধ তাই হাতের সামনে যে টিকিট চেকারকে পেলাম তাকেই আমাদের ফেরার দিনের টিকেটের কথা জিজ্ঞেস করলাম। আরও কিছু কথা হল। অবশেষে বললেন, 'এই ছুটির সময়ে টিকিট পাওয়া খুবই মুশকিল। অনেকদিন আগে থেকেই রিজার্ভ হয়ে যায়। তবুও চেষ্টা করব। আপনি টিকেটের অফিস খোলার পর অতটার মধ্যে আসবেন। আমার ডিউটি থাকবে না। আমার নাম মাইকেল দার্কস্তা। ওখানে ফিরে এসে 'মাইকেলের' খোঁজ করবেন। বলবেন আপনি আমার আত্মীয়। না হলে আমি আপনার জন্য চিঠি রেখে যাব, কি করতে হবে।' সময়মত এসে দেখি মাইকেলবাবু একটা চিরকুটের সঙ্গে চারটে টিকেট রেখে গেছেন। কাউন্টারের ভদ্রলোক বললেন, 'অনেক ফোনটোন করে উনি এই টিকিটগুলো রেখে গেছেন আপনাদের জন্য। বলে গেছেন ওনার কোন নিকট আত্মীয় যাচ্ছেন'।

দেশে ফিরে যখন বর্ধমানের এক গ্রামে 'দেশে' যাই রিক্সা নিলে প্রত্যেকবার রিক্সাওয়ালারা টাকা নেয় না। কারণ 'দেশে' এসে ওই টাকা দেওয়ার দায়িত্ব না কি আত্মীয়দের। আত্মার সঙ্গে এত লোকের সম্পর্ক হওয়াতে সুবিধা অনেক।

কিছুদিন পর নিউইয়র্কের জন এফ্ কেনেডী এয়ারপোর্টে কাস্টম্‌স্ করে বেরিয়েছি, দেখি আমাদের ইহুদী আত্মীয় জে হাইম্যান গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। কতজন এসেছে স্বপ্না, প্রসাদদা, লর্ন, ফতিমা, তৃপ্তিদা, আসাদ, আরও কতজন, চারজনের মাল একটা গাড়িতে যদি না ধরে। দেশে গিয়ে দেখি আমাদের আরেক আত্মীয় যে পাকিস্তানী ছেলেটি আমাদের অবর্তমানে বাড়িতে ছিল, সে রান্নাবান্না করে রেখেছে। আর একগাদা ভাল জাংক মেল (বাজে ডাক)-এর মধ্যে এ্যালাবামার

কে-মার্ট-এর ম্যানেজারবাবুর একটা চিঠির সঙ্গে ওই দামী জিনিষের ফেরৎ টাকা। মাফও চেয়েছেন আমার এই অসুবিধার জন্য। মনে মনে গেয়েছিলাম :

ধনধান্যে আত্মীয়ে ঘেরা—
আমাদের এই বসুন্ধরা,
তারই মধ্যে আমার দেশ
সব-ই সবার সেরা,
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা হলেও
দেব, দেবীতেই ভরা।

সাদা কালোর কথা, মনে লাগে ধাঁধা

তরুণ খুব ভোরে, সময়ের কয়েক ঘণ্টা আগেই এসে হাজির। অনেকদিনের ইচ্ছা সে যেন-তেন-প্রকারেণ আমেরিকা আসবে। অত সময় ধার করা বড় স্যুট-টাই-এ অসুবিধা হচ্ছিল বই কি! তার ওপর ওই গরম ও আর্দ্রতা। কিন্তু আমেরিকার ভিসার আশায় রক্তে ড্রেনেলিনের কল্যাণে তা মোটেই গায়ে লাগছিল না। দরজার গোড়ায় এক বাঙালী মহিলা পথ দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল, "ওই দিক দিয়ে যান।" ওনার কথামত কাগজপত্র ঠিক করে সাজিয়ে মনে মনে ভেবেছিল "এই মাল আবার এখানে কেন?" পরের কর্মকর্তা একজন সাদা মহিলা ছিলেন। ওনাকে দেখে তরুণের সত্যিই আনন্দ এসেছিল। মৃদু হেসে মাথাটা একটু নুইয়েছিল।

ওয়েটিং রুমে বসে থাকার সময় এক ভদ্রলোক সবার কাগজগুলো দেখে যাচ্ছিলেন। কারও কারও সঙ্গে আলাদা করে কথাবার্তা বলছিলেন। এবং কেউ কেউ চলেও যাচ্ছিলেন। ওনার ব্যাজে লেখা ছিল—মিঃ উইলিয়ামস্। তরুণের কাগজপত্র দেখে উইলিয়ামসবাবু বললেন :

"হোয়াট আর ইউ হিয়ার ফর?"

"ইয়েস স্যার।" আমেরিকান উচ্চারণ না বুঝেই সে উত্তর দিয়েছিল।

"আর ইউ ফর বিজনেস ভিসা?"

"ইয়েস স্যার।" এটাও সে বুঝতে পারেনি তবে উত্তরটা কাজে লেগে গিয়েছিল।

"আর ইউ গোয়িং টু সেট আপ বিজনেস ইন আমেরিকা? হোয়াট টাইপ?"

আবারও সেই উত্তর "ইয়েস স্যার।" পাশের লোকটি কনুই মেরে কিছু উপদেশ দিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই উইলিয়ামস্‌বাবু কাগজের ওপরে একটা কি লিখে ভেতরে চলে যান। তরুণের যখন ডাক পড়ে তখন এক বাঙালী ভদ্রলোক ওকে একটা ঘর দেখিয়ে দেন।

ঘরে ঢুকেই তরুণ দেখে এক ভারতীয় মত কালো ভদ্রলোক বসে আছেন। নাম মিঃ টি. দাস। দাসবাবুকে দেখে ও একেবারে হতভম্ব। ঠিক বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা কি! দাসবাবু তরুণের কাগজগুলো দেখতে দেখতে প্রশ্ন করে, "হোয়াটস্ ইওর ফুল নেম।"

তরুণের কথাগুলো কানে সঠিক না যাওয়ায় সে বাংলাতে বলে, "আমি ভিসা স্যারের কাছে এসেছি!"

মিঃ দাস মাথাটা না তুলেই বলেন, "পারডন? ইন ইংলিস প্লীজ।" এতক্ষণে তরুণের সম্বিত ফিরে এসেছে আমেরিকা দেশ থেকে নিজের দেশের মাটিতে।

"আই কাম ফর ভিসা, স্যার।"

ওদিক থেকে কোন এক জরুরী ফোন এসেছে জানতে পেরে মিঃ দাস বলে গেলেন, "প্লিজ এক্সকিউজ মি, আই মাস্ট টেক দিস কল। আই উইল বি ব্যাক ইন এ মিনিট।" বলেই ঘর থেকে

বেরিয়ে গেলেন। বসে বসে তরুণ আকাশপাতাল চিন্তা করছে। হয়ত পঁচিশ-তিরিশ সেকেন্ড হবে। কি ভেবে সে হঠাৎ দরজা দিয়ে বেরিয়ে এক এ্যাসিস্ট্যান্টকে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, আমি তো ভিসার জন্য এসেছি, মিঃ ইউলিয়ামস্-এর সঙ্গে দেখা করব। আপনি আমাকে বেংগলী লোকটার কাছে পাঠালেন কেন?"

"যার কাছে পাঠিয়েছে ঠিকই করেছি, উনি আমেরিকান। উইলিয়ামস্, মিঃ দাসের এ্যাসিস্টেন্ট। ভিসা চান তো চুপ করে ঘরে বসুন।" সোজা উত্তর।

তরুণ একেবারে আকাশ থেকে পড়ল! মনে হয় বলতে চেয়েছিল, "হে ধরণী, দ্বিধা হও। মা সীতার মত কোলে তুলে নাও।" কিন্তু না, এদেশে তো আর থাকা যায় না। মনে মনে বলেছিল, "কেন যে এই কালাকুলা লোকগুলোর কাছে পাঠায় তা বুঝতে পারি না। সাদা লোকগুলোই ভাল। ওরা যেন শিব ঠাকুর। আমাদের লোকগুলো খুবই শয়তান হয়।"

দেশের এয়ারপোর্টের সবাই-এর চোখের জলের কথা ভাবতে ভাবতেই কেনেডী এয়ারপোর্টে হাজির। সময় যে কি ভাবে কেটে গেল তা বুঝতেই পারেনি। মনটা ভারী। কিন্তু নতুন দেশে নামতে হবে ভেবে মনটা আবার শঙ্কায় ভরে গেল। "কি জানি সুদীপ, মহসীন, ও বিশ্বনাথ এসেছে তো?" ভাবল সে। না হলে এই সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে কি হবে কে জানে। এছাড়া এ্যাটলান্টার এক ইউসুফ, অটোয়ার এক কৃষ্ণলাল, ও নিউ জার্সির এক ডেভিড-এর ফোন নম্বর এনেছে। ওদের নাকি ফোন করলেই চলে আসবে। এই জায়গাগুলো সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই। তবে এরা ওর জেলার লোক। দেশে হিতাকাঙ্ক্ষীরা বলে দিয়েছেন যে অন্য বন্ধুরা না আসলে এদের ফোন করতে।

প্লেন থেকে নেমে তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না এটা আমেরিকা। মনে হয় সাদার থেকে যেন না-সাদা কালো, স্প্যানিশ, ভারতীয়, চীনাই বেশি। তরুণের পাসপোর্টে যে ছাপ দিয়েছিল সে তো বোধহয় চীনা। "এ আবার কি?" ভাবে তরুণ। লাগেজ চেক-এর কাছে অনেক কালো স্প্যানীশ-এ ভরা। এটা হয়ত সে আশা করেছিল। দেশে কে যেন বলেছিল, "ওরা সব বাজে লোক?" কিন্তু পাইলটও মনে হল কালো ছিলেন। গুলিয়ে যাচ্ছিল সব।

ইমিগ্রেসন, কাসটমস্ পেরিয়ে এসে দেখে চেনা কেউ নেই। আস্তে আস্তে মনে ভয় সরতে শুরু করেছে। এদিক ওদিক দেখছে। মাল সমেত যাতায়াত মুসকিল। প্লেন-এ এক ভদ্রলোককে বাংলায় কথা বলতে শুনেছিল, আলাপ করে নি তখন। "কি হবে যার তার সঙ্গে আলাপ করে," ভেবেছিল সে। সেই লোকটিকে দেখে মনে হল যেন হাতে চাঁদ পেয়েছেন। মনে হল অনেকদিন চেনে। ছুটে গিয়ে তাকে বলে, "দেখুন, আমার পরিচিত কেউ আসে নি, কি করি বলুন তো?" সেই পরিচিতই নিজের পয়সা দিয়ে খোঁজখবর করেছিল। বিশুর নম্বরে। অন্য নম্বরগুলোও বোধহয় ফোন করেছিলেন। বিশুর নম্বরে কিছু কথা বলার পর উনি তরুণকে ফোনটা দিয়ে বলেন, "এইখানে কথা বলুন।"

"কে বিশু? কি ব্যাপার, আস নাই কেন?"

"না আমি চপল, বিশুর রুমমেট। ওকে চিঠি দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। আমি তো তিনজনকে লিখেছিলাম যে গতকাল বা আজ নিউ ইয়র্কে পৌঁছব।"

চপল তরুণকে বলে দেয় সে যেন খুব সতর্কতার সঙ্গে এয়ারপোর্টে বসে থাকে। ওরা নিতে আসছে। বলে দিয়েছিল, কালো ও স্প্যানীসদের থেকে যেন সাবধান থাকে। অনেক কিছুই গুলিয়ে যাচ্ছিল তরুণের, কারণ যে লোকটি ওকে একটু বসার জায়গা দেয় সে-ও তো বোধহয় কালো। বসে বসে সাদা কালো ভাল মন্দ এর হিসেব করতে চেষ্টা করছিল। তা সে করেছেও বরাবর।

এরা দেশে থাকতে থাকতে শিখে গেছে কে ভাল, কে মন্দ। সে গরীব দেশের লোকেদের এড়িয়ে চলে, এমনকি বাঙালী ও ভারতীয়দেরও। তবে আড্ডার জন্য বাঙালীই চাই, জেলা ও গ্রামের হলে তো কথাই নেই। একই ধর্মের হলে আরও ভাল। কালো, চীনা, স্প্যানীশ, কোরীয়, অবাঙালী ভারতীয় এড়িয়ে চলাই পছন্দ করে যদি নিজের প্রয়োজন না থাকে। দুবার অবশ্য দুটি কালো ও স্প্যানীয় মেয়ের প্রেমে পড়ারও চেষ্টা করেছিল। দেশের মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করার কি যেন ঝামেলা।

গাড়ীটা কেনার পর থেকে নলিনী রোজই বলে ওদের শহরতলীর বাড়িতে যেতে। তবুও যেতে পারেনি। সেদিন ওর বাড়িতে যাওয়ার পথে পুরনো গাড়িটা কয়েকবার ঝাঁকানী দেওয়ার পর যেন আর যেতে চায় না। কোনমতে হাইওয়ের পাশে দাঁড় করায়। হুডটা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ, বুঝতে পারছে না কি খারাপ হয়েছে। ঘণ্টাখানেক তো দাঁড়িয়েই। অনেক হাত নেড়েছে। ভয় হচ্ছে, সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে। ভগবানকে ডেকেও লাভ হচ্ছে না। একটা নতুন নীল স্পোর্টস গাড়ি দাঁড়াবে মনে হতে যেন আশার আলো দেখল তরুণ। গাড়িটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাক করে তরুণের কাছে এল। কিন্তু কাছে আসতেই বুকটা ধড়াক করে উঠল। দুটো কালো লোক! এক মাঝবয়সী স্যুট-টাই পরা। অন্যজন যুবক, বয়স্ক লোকটি পাশে বসা গাড়িচালক যুবকের সিটের পেছনে হাত রাখা। তরুণ ভাবল, "ড্রাগ ডিলার নয় তো!" আবার ভাবে, "নিশ্চয় কোন বাজে মতলব আছে। গে (Gay) নয়তো? অল্প বয়সী ছেলেটি নেমেই জিজ্ঞাসা করে, "হোয়াটস্ আপ ব্রাদার? হোয়াটস্ দ্য প্রবলেম?"

তরুণ ভয়ে ভয়ে কিছু দেখায়। বয়স্ক লোকটি ওদের গাড়ি থেকে ছোট কি যন্ত্রপাতি দিয়ে নাড়াচাড়া করার পর গাড়িটা আবার স্টার্ট নিল। ধড়ে যেন প্রাণ এল তরুণের। পকেট থেকে ওয়ালেটটা বার করে দুটো ডলার বক্‌শিশ দেবে কিনা ভাবছে। ভয়টা পুরো কাটেনি তখনও। এরা মানুষ না জন্তু তখনও ভাবছে।

বয়স্ক ভদ্রলোক টিসু পেপারে হাত মুছতে মুছতে হেসে তরুণকে বলে, "জান, তোমার গাড়িটা অনেক বছর আগে আমার ডিলারশিপ থেকে কেনা। এখন তোমার গাড়িটা প্রায় কালেকটরস আইটেম তাই খুব খুশি হয়েছি গাড়িটা দেখে। তোমার ব্যাটারী কানেকটরটা ঠিক মত লাগালে কোন অসুবিধাই হত না। গাড়িটার কোন বড় সমস্যা হলে আমার কাছে আসতে পার। দুচার মিনিটে অনেক আলাপ হয়েছিল। তরুণের এখানের দেশ, আগের দেশ সব কথা। তরুণকে একটা বিজনেস কার্ড এগিয়ে দিয়ে বলে, "অবশ্য অল্প ক'দিনের মধ্যেই আমার ছেলে রনি কোম্পানী চালাবে, ও শিগ্‌গির-ই হোয়ারটন থেকে এম. বি. এ শেষ করবে। আর আমি যাচ্ছি তোমাদের দেশে, এমারজিং মার্কেট বিজনেস ভেনচার এর জন্য। আগেও অনেকবার গেছি। আমার খুব ভাল লাগে তোমাদের দেশ।"

নামে কি আসে যায়

চণ্ডী চক্কোত্তি আমার বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইন্‌স্‌টিটিউটে যখন পড়ি তখন থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব। খুবই ভাল মনটা, তবে মুখটা যেন খাটা পায়খানা। ওটাই ওর ক্রুড্ জোক। ক্যামপাসের অনেকে অবশ্য "চণ্ডাল" বলেই ডাকত। বাবা-মা সাধ করে নাম রেখেছিলেন চণ্ডীমুখ। সেটা হয়ে গেল কিনা "চণ্ডাল অসুখ"। যাই হোক আমার কিন্তু ওর চণ্ডাল নামে আপত্তি ছিল কারণ চণ্ডালদের প্রতি সবসময়েই আমাদের একটু শ্রদ্ধা আছে, তাছাড়া ওটাতে আমি বর্ণবাদীতারও গন্ধ পেতাম। আমার চেনা একটি চণ্ডাল পরিবার ছিল। যারা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত, ভদ্র ও নম্র ছিলেন। সেই পরিবারের কারোর মুখে অবশ্য কোন দিন "শালা" পর্যন্ত শুনিনি। আমরা কয়েকজন মিলে চণ্ডীকে "চটি জুতো" বলেই ডাকতাম।

হোস্টেলের ডাইনিং রুমের কাছেই একটা কুকুর থাকত, একটু কাছে গেলেই লেজ নাড়তে শুরু করত। আর আদর করলেই লেজ গুটিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিত। কেউ বকাবকি করলেও বড় একটা পালাত না, বরঞ্চ মাটিতে বসে পড়ত। আর কেউ মাছ-মাংসের টুকরো নিয়ে আসলে তো কথাই নেই; ম্যানেজারবাবু ওকে বুধু বলেই ডাকত। আর সবাই যার যা পছন্দ সেই বলেই ডাকত। আমাদের দেশে তো একরকমের সবচেয়ে বড় অসম্মান হল লোকের নামে কুকুরের নাম রাখা, তাই ওই কুকুরের আরও হাজারো নাম ছিল। সে কি আর মনে আছে? কেন জানি না চণ্ডী ওকে মাঝে মধ্যেই ডাকত "গান্ধী", "গেঁদো", ইত্যাদি বলে। অনেকে আপত্তিও করত, তাতে ওর আরও মজা লাগত। অনেক কাপুরুষ বীরপুরুষ বাঙালীর মত ওরও মহাত্মা গান্ধী বিদ্বেষিতা ছিল। ওর এবং ওর মায়ের কাছেই শুনেছি যে "গান্ধী আমাদের সেই সময় না বাঁচালে লক্ষ্মীনগরে আমরা শেষই হয়ে যেতাম, আমার ছোট্টো ভাইটার (মামা) মতো"। সে আমাদের রক্ষক তাদেরকে "ভক্ষণ" করা তো খাঁটি বাঙালীর চরিত্র। সেই যে দেড়শ বছর আগে পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন, "আমি তো ওর কোন উপকার করিনি, তা হলে ও কেন গাল দিচ্ছে?" সেই রকম মানসিকতা। তবুও চণ্ডী চটিজুতো আমারই বন্ধু।

হোস্টেলের অনেকেই চটিজুতোকে কিছু না বলে আমাকেই ওর এই দুর্ব্যবহারের জন্য আপত্তি জানাত। আমি ওদেরকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতাম যে, "ও ওটা আদর করে বলে, অসম্মানে নয়"। অন্যেরা তখন আমাকেই বলত, "পাগল"। আবার চটিজুতো শুনে রেগে আমাকে শাপ দিয়ে বলত, "শালা তোর নামে কুকুর ছাগল একটা রাখবই"। কিন্তু ক্যামপাসে কুকুর ছাগলের পেছনে ছুটে ছুটেও চটিজুতো আমার নামকরণ করে উঠতে পারেনি।

এর কয়েকবছর পরে শার্লি আর জনের নিমন্ত্রণে গেছি তাদের ফার্মে। পশ্চিমে। শহর থেকে ঘণ্টা দু-তিন। ফার্মে ঢোকার মুখে দেখি শার্লি ও আরও কয়েকজন একটা কুকুরকে ডাকছে "গান্ধী",

"গান্ধী" বলে। গান্ধী তো নয়, গ্যানডী। বললাম, "ব্যাপার কি? হাউ কান ইউ ডিসলাইক গান্ধী? মহাত্মাকে এত অপছন্দ কেন?" সাদা, কালো, সাহেব, সাহেবা অনেকেই শাঁখা-সিন্দুর শাড়ী বা ধুতি পড়ে, একেবারে খাঁটি বাঙালী, বাংলা গানও করে। প্রায় সবাই এক সঙ্গে ঘুরে বলে "কি বলছো? হোয়াট ডু ইউ মিন? হি ইস্ আওয়ার মোস্ট বিলাভেড এ্যানিমেল। ও আমাদের সবচেয়ে স্নেহের। ওকে আমরা সম্মান করেই গান্ধী বলি! আমাদের এই "জয়গুরু" খামারে ও-ই একমাত্র মাংসাসী। তাই তো আমরা সবাই ওর খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এভরিবডি লাভস হিম। ঠাকুরকে পূজো করার পরেই তো ওর ডাক পড়ে"। আগেই শুনেছিলাম আমেরিকা ও পশ্চিমে ভালবেসে প্রিয়জনের নামে নাম রাখে বাড়ির আদরের পোষা জীবজন্তুর। এক বন্ধু তাদের বেড়ালের নাম রেখেছিল রোজ্যান। তাদের মৃত ঠাকুরমার নামে। আর রাষ্ট্রপতি রেগনের নামে, তার কত ভক্ত তাদের কুকুর, বেড়ালের নাম রেখেছে রন, রনাল্ড বা রেগন তার কেই বা হিসেব রেখেছে। এটা আমার ঠাকুরদার স্বর্গের পথ প্রশস্ত করার জন্য সবচেয়ে বড় নাতীর শিবঠাকুরের নামে নাম ও বড় নাতনীর নাম "গীতা" দেওয়ার মত। কলকাতার একটা মেয়ের নামে 'জয়গুরু'র একটা ছাগলের নাম ছিল "শ্যামলী"। অন্য এক ছাগলের নাম ছিল জগমোহন, ও আরও কত কি। শ্যামলী তখনও পুরো বড় হয়নি। সাদা রং। সুন্দর দেখতে। শ্যামলীকে একটু ভাল করে দেখে নিলাম। আদরও করলাম পাঁজা কোলা করে। এর ক'দিন আগেই আমাদের এক বন্ধুর মেয়ের নাম রেখেছিলাম শ্যামলী, তাই হয়ত আরও একটু বেশি আদর করেছিলাম।

খবর শুনেই গিয়েছিলাম হাসপাতালে কর্তা-গিন্নী দুজনে, বন্ধুর কন্যারত্নকে দেখতে। তখনও নামকরণ হয়নি। জিগেস করলাম, "কি নাম রেখেছো মা দুর্গার?"

"এখনও কিছু ফাইনাল হয়নি। কাইগুলি একটা নাম দেবে?"

শুরু করেছিলাম লরা, লারমিন, লেস্লী, ইত্যাদি দিয়ে। তাতে আপত্তি জানিয়ে বলল, "না, না, ও তো আমরাই খুঁজতে পারি। গিভ আস এ্যান ইন্ডিয়ান নেম। একটা ভারতীয় নাম দেবে?"

"আর ইউ সিরিয়াস? তোমরা সত্যি বলছ?"

"আমরা তো ভাবছিলাম শেফালী দেব। ওটা আমাদের পছন্দ। ওটা শেলীর সঙ্গে ম্যাচও করে"। এই ছোট্ট শিশুটির মায়ের নাম শেলী। ওর মা-বাবার মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে ভেবেছিলাম, "হয়ত বা দুর্গা নামটাই মানানসই হবে"।

নিজের নামে নাম আমাদের দেশে এখনও চল নাই। তাই আমার স্ত্রী শেফালী, আপত্তি জানিয়েছিল। অনেক ভেবেচিন্তে নাম দেওয়া হয়েছিল "শ্যামলী"। এটা মাইকেল ও শেলী দুজনের নামের সঙ্গেই মিলেছিল। পুরো নাম শ্যামলী এলিজাবেথ "Shyamolee"। "Y"টা বাদ দিলেও হত কিন্তু "Y" ছাড়া শুধু "Sham" ভাল দেখাচ্ছিল না। নামের অর্থ শুনে মাইকেল আবেগ ভরে বলেছিল, "আহা কি সুন্দর নাম! এটা নিশ্চয়ই ভগবানেরই আশীর্বাদ। এ তো আমার দেশ ক্যানসাস-এর রোলিং ফিল্ড, বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর এর কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। ক্যানসাসই তো হচ্ছে শ্যামল-ভরা দেশ। যে আমার মা, শ্যামলী আমার মেয়ে"।

"জয়গুরু" খামারে গিয়েছিলাম আবার বেশ কয়েকবছর পরে, ঠিক সন্ধ্যার মুখে। আমেরিকার একটা খাঁটি বাঙালী খামার আশ্রম। অনেক পরিবর্তন দেখে ভালই লেগেছিল। তুলসীতলায়

সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়ার আগেই দেখি শার্লি, যাকে অন্য সবাই দেবীকা বলেই ডাকে, একদল ছাগল তাড়িয়ে আনছে। প্রায় ছুটে কাছে এসে বলে, "সাচী তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।" আমার হাত ধরে টেনে এনে বলে, "এ হচ্ছে আমাদের আশ্রমের "সাচী"। কত সুন্দর ছাগলটা, তোমার অনারে। তোমাকে দেখানোর জন্য অনেকদিন আমরা অপেক্ষা করে আছি। চিন্তায় পড়লেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, চটিজুতো-এর কথা ভেবে। শকুনের সাপে গরু মরল, না বাঁচল?

"নিশিদিন ভরসা রাখিস হবেই হবে"

আমার চিঠি পেতে ও পড়তে বেশ ভাল লাগে, এবং দেশ থেকে ফিরে এলে আমার ভাগ্য খুলে যায়। আমি কুশল জানানো একাধিক চিঠি পাই বিভিন্ন আত্মীয়-বন্ধুর কাছ থেকে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এর মধ্যে তিনটে চিঠি যা প্রায় একই এলাকা থেকে আসে, যদিও বেশ কিছুদিনের ব্যবধানে, তবে মনে হয় এরা বোধহয় সবাই একই সঙ্গে লিখতে বসেছিল এবং যেন অজান্তে নিজেরাই নিজেদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে।

ওঁমা

মোল্লাপাড়া
দৌলতপুর জেলা

স্নেহের সাচী,

তোমাদের চিঠি দিতে অনেক দেরি হয়ে গেল বলে কিছু মনে কর না। তোমাদের সবাইকে দেখে যে আমাদের কি ভাল লেগেছে তা আর বলার নয়, সবাইকে বলেছি। আর কিছু সময় থাকলে ভাল হত। তোমাদের নিয়ে যে পুরনো কালীবাড়ি গিয়েছিলাম, তোমরা চলে যাওয়ার পর আবার সেখানে গিয়েছিলাম তোমাদের জন্য পূজো দিতে। একটু ফুল-বেলপাতা পাঠালাম। মাথায় ঠেকিয়ে রেখে দিও।

তুমি হয়ত জানো না যে এই ক'বছর ধরে আমরা কি অশান্তির মধ্যে আছি। সব কথা তো অন্য লোকের সামনে বলা যায় না তাই সেদিন তোমাদের সব কথা বলি নি।

গত কয় বছরে তোমার পিসের ছোট ব্যবসাটা দুবার ভেঙে তছনছ ও লুটপাট করেছে। পার্টিশনের পর থেকে পাঁচ বা ছ'বার তা মনেও নেই। পুলিস, ম্যাজিস্ট্রেট সবার কাছে ছুটেছি। গতবার ওখানকার অনেক হিন্দু ও মুসলিম ছেলেরাও পুলিশের কাছে ডায়েরি করে বলে এসেছে কারা এসব করেছে এবং কোথায় আমাদের জিনিষপত্র আছে। সরকারকেও ক্ষতিপূরণের জন্য দরখাস্ত করেছিল তোমার পিসে। আমাদের পাড়ার এক ছেলে, নানটুর সহপাঠী, সে বেশ উঁচু পজিশনে আছে, তাকেও বলেছিলাম। সে বলেছে, "হিন্দুদের এ সব হবেই।" তোমার পিসে ও ঠাকুরপোর নামে কয়েকবার উড়ো চিঠি এসেছে। তবুও ঠাকুরকে ভরসা করে বেঁচে আছি। তোমার পিসে তো ওই দুঃখেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। শেষে গ্রামের বাড়িতেই ছিলেন। অবস্থা খারাপ হলে ওনাকে ঢাকাতে নিয়ে যাই। সেখানে শানটুর বন্ধুদের বাড়িতেই ছিলাম বেশ কিছুদিন। তারা যে কি ভাল মানুষ তা আর তোমাকে কি ভাবে বোঝাব। ঠাকুরই সব দেখেন। তবুও ওনাকে সেখান থেকে ফেরাতে পারলাম না। সবই আমার ভাগ্য। গতবারের দাঙ্গার পর থেকেই উনি

ভেঙে পড়েছিলেন। বলতেন, "এযে, সর্ষের মধ্যেই ভূত?" তবে যে মানুষ '৭১-এ বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে, পোড়া ব্যবসার ওপর দাঁড়িয়েও ভাঙেন নি, তিনি তো সহজে ভাঙার মানুষ নন। বলতেন, "ভূত যেমন আছে, ভূত তাড়াবার ওঝাও এদেশে আছে।"

তুমি জানো কি আমাদের গ্রামের বাড়িটা এখন বেহাতে আছে? তোমার পিসেকে নিয়ে আমরা যখন ঢাকা যাই তখন আমাদের পুরনো ঝি ঘণ্টার মা-এর কাছে বাড়িটা রেখে যাই। পাশের ঘোষ কাকা, পুরুতবাড়ি, ও মান্নানদের বলে আসি। ক'দিনের মধ্যেই পশ্চিমের আল্‌তাফরা ঘণ্টার মার ওপর চড়াও হয়ে বাসা দখল করে। পাশের সবাই গিয়েছিল, অনেক ঝগড়া হয়েছে। পুলিশের কাছেও যায়, পুলিশ তাদের প্রথমে বলে যে তোমার পিসে ও ঠাকুরপো নাকি সব বিক্রি করেছে। পরে বলেছে, ওটা নাকি এনিমি প্রপার্টি। আগে আমাদের কেউ বলেনি। ফিরে এসে আস্তে আস্তে জেনেছি। ঘণ্টার মা এখন এখানেই আছে। ও তো আমাদের বাড়িরই লোক। ওকে ছেড়ে থাকবই বা কি করে? ঠাকুরপো কেস করেছে। তার পরদিনই আলতাফ্‌রা তুলসীতলা ও ঠাকুরঘরে গরু কেটে সবাইকে দেখায়। ঠাকুরের তাতে কি মান যায়? তোমার কি মনে হয়? এবার এত অসুবিধার মধ্যেও ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম থেকে ঐক্য পরিষদের লোকেরা এসেছিল, দত্ত, ভৌমিক, সাহা, রহমান, মোমেন, বাণীদি, গমেজ, ঘরামী, বিশ্বাস, আরও কে কে যেন। কি যে ভাল লেগেছিল তা আর কি বলব, ভেবেছিলাম সবই ঠাকুরের ইচ্ছা। ভেবেছিলাম আমরা একা নই। শুনেছি আলতাফ্‌রা ওদের কিছু বলেছে। ঠাকুরপো বলেছে, "বৌদি, গুরু পূর্ণিমার দিনে আমরা আবার গৃহপ্রবেশ করব।"

তোমাদের দেওয়া শাড়িটা ওই সেইদিনই ঠাকুরের পায়ে ঠেকিয়ে ছোট জা নন্দিনীকে দিয়েছি। ওর গায়ে খুব ভাল মানায়। আমার কি আর সেই বয়স আছে? সেই '৫৫ সালের পরে দাদা, সেজদা, দিদি কারও সঙ্গে দেখা হয়নি। তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আমরা যখন বাজারে ও মন্দিরে যাই তখন অনেক কথা হয়েছে, তা হয়ত সে তোমাকে বলেছে। তোমার স্ত্রীকে চিঠি দিতে বল। তোমরা আমাদের স্নেহাশীষ নিও। গুরু পূর্ণিমায় অবশ্যই এস।

ইতি —
আং ছোট পিসি

চণ্ডীপুর, দৌলতপুর

শ্রদ্ধেয় দস্তিদার সাহেব,

আপনার সব চিঠিই আমরা পেয়েছি। আব্বা ও আম্মার ফটো খুব ভাল এসেছে। আপনাদের পাঠানো জিনিষগুলো মেজভাইয়া সাজ্জাদ ও রানীভাবী পেয়েছে। রানীভাবীরা নিশ্চয়ই আপনাদের লিখেছে। ওগুলির ওনার শখ অনেকদিনের। আপনি আপনার বন্ধু অরূপ গাঙ্গুলীদের পৈতৃক বাড়ি দেখতে পারেননি বলে কিছু মনে করবেন না। বড় ভাইয়ারা চাইলেও মুসলমান বাড়ির ভিতরে কিছু অচেনা হিন্দুকে ঢোকাতে আমার আম্মা চাইতেন না। এর পরের বার এলে আমি চেষ্টা করব। আমি কিন্তু আপনাদের বাধা দিইনি।

সে দিন আপনি আমাকে বলেছিলেন আমি নাকি হিন্দু-বিরোধী রাজনীতি করি। তখন আপনার

সাথে কথা বলা হয় নি। জানি না আপনাকে এ কথা কে বলল। বড় ভাই রাজনীতি করেন সে তো আপনি জানেন, এবং ওর সাথে আমার রাজনীতিতে মেলে না। আমি ইসলামী রাজনীতিতে বিশ্বাস করি এবং এখন এ-দেশ তো মুসলমানদের দেশ, তাই আল্লার উপর আস্থা রেখে সবাই-এর দেশ গড়তে হবে। ইন্ডিয়ায় মুসলমানদের দেখেছেন? আমাদের মাইনরিটিরা তো রাজার হালে আছে। আমরা তাদের ভাল রেখেছি, এটা ইসলাম চায়।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আমাদের হিন্দুদের মন্দিরগুলো কারা ভেঙেছে। আপনার আত্মীয় ধোপাবাড়ির পুকুর থেকে কারা মাছ তুলেছে জানেন? মহম্মদ হানিফের লোক। সে তো এম. পি। পালেদের বসত বাড়ি? দাসদের জমি? সে তো অন্য পার্টির লোকের হাতে। আমাদের নাম দিচ্ছে। নরেন গায়েন-এর মেয়েটার সঙ্গে কার বিয়ে হল? তবলীগ অবশ্য আমাদের ওখানেই হয়। এটা তো একটা সামাজিক উৎসব, তাই। গরীব দত্তদের ছোট মেয়েটার জন্য আমি এক পাত্র দেখেছিলাম তাতে ওদের ভালই হত। শুনেছি জেলার বাইরের কে যেন বিয়ের ব্যবস্থা করেছে। আল্লার দোয়ায় তারা যেন ভাল থাকে। তারা কি ইন্ডিয়ায় যেতে চায়?

আমিও এখন ফরেন যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমেরিকার লটারীতে নাম লিখিয়েছি, তবে আমি তো মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেছি তাই এখন সৌদিয়া, আমিরাতি ও মালয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। শুনেছি মালয়-ও নাকি মুসলমানি দেশ? আপনি গেছেন সে দেশ? আমার ইন্টার পাশ করা বন্ধু নাজিরউদ্দিন আমেরিকা যেতে চায়। ওর পাসপোর্টের কপি পাঠালাম। ওর চাকরী পেলে জানাবেন। আপনি আমাদের দোয়া করবেন।

ইতি —

মোঃ আব্বাস

পুঃ- আপনি আমাকে মোঃ আব্বাস বিশ্বাস লিখতে পারেন, যদিও এখানে সবাই মোঃ আব্বাস করিম বলেই জানে। বিশ্বাস আজকাল লিখি না।

ওঁ ভগবান সহায়

রাজারহাট

জিলা ঃ দৌলতপুর

পূজনীয় ছোটদাদু ও ঠাকুমা,

প্রণাম জানবেন। বাবা-মা আমাকে বলল তাই লিখছি, ওরা তো লিখতে পারে না। মাকে দেওয়া আপনাদের নতুন শাড়ীটা দিদিমা আমারে দিছে। ওইটা আমারও খুব পছন্দ। আপনি তো জানেন মা হঠাৎ করে মারা গেছে। খুব জ্বর হয়েছিল।

খুলনার মামু খুব চেষ্টা করেছিল। উনিই তো আমারে বাঁচাইছে। পাশের গ্রামের মঞ্জুরকাকা নিতে আসছিল তার এক জানা ছেলের সঙ্গে বিয়া দিতে। এক মৌলবীও আনছিল। মায়-বাবায় আপত্তি করায় মারে মারছিল, আমরা ছোটলোক তাই। বাড়িতে এখন কোন জিনিষ নাই। সব তারা নিছে। ঢাকা, সিলেট, যশোর থিকা কিছু হিন্দু-খৃস্টান মুসলমান লোক দেখতে আসছিল মা-বাবারে। তাদের কাগজে নাকি লিখছে। মায়রে কিছু বাসনপত্র দিছে। বলছে আবার আসবে। আমি তো খুলনার মামুর বাসাতে লুকিয়ে ছিলাম অনেকদিন।

উনিই তো আমার বিয়া ঠিক করেছিলেন। আমার স্বামী মঙ্গলগঞ্জের কলেজে পড়ে। দেশ অভয়কাঠি। ও কইছে আমারেও সে কলেজে পড়াবে। আমি অঙ্কে প্রথম হইছিলাম, ইংরাজী ও ইতিহাসেও ভাল নম্বর পাইছিলাম। আনোয়ারা আপা গানও শিখিয়েছিলেন। আপনি তো নাকি উনার সঙ্গে ইস্‌কুলে দেখা করেছিলেন।

দাদু, ভাইবোনেদের নিয়ে আসবেন আবার। আমাদের অভয়কাঠিতেও আসবেন। আপনারে শ্বশুরমশাই বলেছেন লিখতে। আপনি কি আমাকে আমার মা-বাবা ও বাড়ির ছবি পাঠাবেন? কিছু মনে করবেন না এটা লিখলাম বলে। ও ছুটি পেলে ও আর ওর ভাইয়েরা আমাদের বাড়িটা ভাল করবে। আমাদের সবসময়েই আপনাদের দেখতে ইচ্ছা করে। ওকেও চিঠি দেবেন। ওর নাম শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার দাস। ও আট ভাই ও দু বোনের মাঝে। আশীর্বাদ করবেন ও যেন মামুর মত হতে পারে। ওর ওপর ওদের অনেক ভরসা।

দাদু, আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা খুব ভাল। তারা আমারে পড়াবে বলেছে। আমার কোন কষ্ট হয় না। সন্ধ্যা দিদির কাছে গানও শিখায়। আনোয়ারা দিদি যে গান শিখায়ছিলেন সেটা উনিও জানেন ও আমার শ্বশুরের খুব পছন্দ। উনি সবসময় এই গানটা গাইতে কয় :

"নিশিদিন ভরসা রাখিস হবেই হবে,
ওরে মন হবেই হবে।..."

আপনারা আমাদের আশীর্বাদ করবেন যেন ঠাকুরের কৃপায় আমরা ভাল থাকি।

ইতি —
আপনার
শ্রীমতী দোলারানী দাস

যেখানে দেবদেবীরা বাস করেন

দেবতুল্য কথাটার মানে কি শ্যামলবাবুর সঙ্গে দেখা না হলে বুঝতাম না, যদিও ছেলেবেলায় দেখেছি কয়েকজনকে। সারা জীবন শুধু অন্যের জন্য করেই গেলেন। তখন বেশিটাই শোনা কথা, উপলব্ধি করিনি। তবে আমেরিকাসহ অনেক জায়গায় শ্যামলবাবুর মত কিছু লোককে দেখেছি তা না বললে অন্যায় হবে। সে কথায় পরে আসছি।

ঢাকা থেকে কয়েক ঘণ্টা বাসে এসে বাসস্ট্যান্ডে নেমে আমার আত্মীয় অমলবাবুর বাড়ি যাওয়ার পথে বাঁদিকে রামঠাকুরের আশ্রম ও ডানদিকে রাস্তার ওপরেই একটা ছোট্টো ঘর। বাইরে থেকে মনে হয় বড়জোর চারফুট বাই চারফুট হবে। ওপর দিকে লাল সিমেন্টের ওপর সাদা সিমেন্টে বড় করে লেখা প্রতিষ্ঠানের নাম "হিন্দু সৎকার সঙ্ঘ"। এর ওপরেই একটু ছোট আকারে লেখা : "দুঃস্থ, নিঃস্ব ও বেওয়ারিশ সৎকার"। ক'বছর আগে এটাকে খুবই খারাপ অবস্থায় দেখেছিলাম, গতবার দেখলাম লেখাগুলো ঝক্‌মক্ করছে। অক্ষরগুলো হবে আধ থেকে এক ইঞ্চি উঁচু করা। দেশে এরকম তো দেখিনি তাই হয়ত চোখে পড়ল। উল্টোদিকে রামঠাকুরের আশ্রম কে না জানে, দেশবাসীর গর্ব! কত ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান হয়েছে এখানে! তবুও ছাড় পায়নি ধর্ম—বিদ্বেষী অমানুষ কিছু লোকের কাছে। সেই পার্টিশানের পর থেকেই ধর্ম-বিদ্বেষীরা আক্রমণ চালিয়েছে বার কয়েক। এই তো কিছুদিন আগেও এর ওপর সংঘটিত হল আক্রমণ। পুলিশ তো আর পুলিশ নয়। আর শাসনকর্তারা শাসন করছে না শোষণ করছে তা কি আর ভাববার দরকার? যদিও আশ্রমের অনুষ্ঠানে সবসময়ই জড়িত থাকেন হিন্দু-মুসলমান -বৌদ্ধ-খৃস্টান, বাঙালি-অবাঙালি। গেলবার দেখলাম আশ্রমের চারদিকে ফুল গাছের বেড়ার বদলে উঠেছে বড় দেওয়াল। দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান, ব্রাহ্ম, নাস্তিক ও অনেক মুসলমানও যেন নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাবার জন্য নিজেদের দেওয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলেছেন। এখন আর ঘোমটা দিয়ে নিজেদের আড়াল করলে চলবে না, বর্ম দিয়ে দেহটা ঢাকতে হবে। "কবে হল?" জিজ্ঞাসা করাতে রিকশাচালক আহ্‌সান সাহেব সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললেন, "স্যার, রামঠাকুর তো আর জাহান্নামে যাবে না, যাইতেছি তো আপনি আমি সবাই। ...এটার উপর যা হইল।..." আহ্‌সানের কথায় আবার মনে পড়ল যে আমাদের দেশের অশিক্ষিত লোকরা অনেক শিক্ষিত লোকের খোরাক জুগিয়েছেন : সেই বেহুলার গল্প থেকে লালন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ।

এক সময় সুযোগ পেয়ে অমলবাবুকে "সৎকার সংঘ"-এর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

"বলেন কি? ওনার সঙ্গে এখনও আলাপ হয়নি? এ আবার কি কথা? চলুন এখুনিই নিয়ে যাচ্ছি। ওনার মত লোক হয় না। উনি তো একজন দেবতা। সাক্ষাৎ ভগবান।..." আমি যতই ওনার কথা শুনি ততই উৎসাহ বাড়ে, কিন্তু শ্যামলবাবুর সঙ্গে কোনবারই ভালমত কথা হয় না।

একবার দেখি কিছু লোকের সঙ্গে সিরিয়াসলি গুরুগম্ভীর আলোচনা করছেন। আরেকবার একদল শিশুকে এক শিবমন্দিরের চত্বরে বসে হারমোনিয়াম নিয়ে গান শেখাচ্ছেন। একবার দেখি কিছু শিশুকে পড়াচ্ছেন। অন্যবার শুনলাম ধর্ম-বিদ্বেষীদের হাতে ভাঙা এক শ্মশান সারাতে গেছেন। এই ধরনেরই কিছু হয়েছে প্রত্যেকবার। আমিই বাধা দিয়েছি ওনাকে কাজ ফেলে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করাতে। শুধু ভেবেছি যে, মানুষ কত উঁচুতে উঠলে যত বেওয়ারিশ হিন্দু ও বৌদ্ধ লাশ পান তা নিজের খাটুনি ও খরচায় বিধিসম্মত উপায়ে একজন মানুষ তা সৎকার করেন। পঁচিশটা লাশ সৎকার হলে শ্রাদ্ধের আয়োজন করেন এবং একশটা সৎকার হলে মাথা ন্যাড়া করে বড় করে শ্রাদ্ধ করেন এবং পিণ্ডি দেন। শ্যামলবাবুর মাথা ন্যাড়া হওয়ার কথা বলার সময় আমার আত্মীয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাজীসাহেব জানালেন, "ও লোকটাকে দেখলেও ভাল লাগে। জানেন, ওনার সাদা কাপড় পরে মাথা মুন্ডণ দেখলে আমার হজ করার কথা মনে পড়ে।" যেবার শ্মশানটা ভাঙা হচ্ছিল সেবার অন্যান্য হিন্দুদের সঙ্গে হাজী সাহেবও ছুটে গিয়েছিলেন ওটা রক্ষা করার জন্য। দেব-দেবীর সঙ্গে আমার কোনদিনই দেখা হয়নি সেই জন্যই বোধহয় শ্যামলবাবুর সঙ্গে আমার দেখা অল্প-সল্প। সেটাই ভাল।

আমাদের আশ্রমের পেছনে যে শ্মশানটা আছে তা ওনার সংঘ রক্ষণাবেক্ষণ করছেন এবং তা দেখার মত। এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সংগঠিত শ্মশান এর আগে কোথাও দেখিনি। এটা একটুও অত্যুক্তি নয়। দেশে আজকাল হিন্দু-বৌদ্ধদের সৎকার করাও মুসকিল হয়ে পড়েছে। সরকার ও মধ্যবিত্তরা অনেক শ্মশান "শত্রু সম্পত্তি" বলে দখল করেছেন। "সে মরিয়া বাঁচিল" একথাও অনেক সময় বলা যাচ্ছে না। এই ক'দিন আগে আমি নিজে দেশের বিভিন্নপ্রান্তে অন্তত পাঁচটা শ্মশানকে শ্মশান করা হয়েছে দেখে এসেছি। ঢাকা শহরেই আমাদের এক পরিচিতের শেষকৃত্য করার কি অসম্ভব ঝামেলা তা নিজেই দেখে এলাম দুর্ভাগ্যবশত। তাছাড়া ইদানীং দাহ করতে যাওয়ার সময় কয়েকটি পরিবারের অপমানিত হওয়া, ঝামেলা হওয়ার কথা জানি। এ অনাচারও নয়, নিপীড়নও নয়, এর ভাষা অভিধানেই নেই। উত্তর বাংলার এক মহিলা, সীতাদেবী, আমার বন্ধুর বাড়ির ঝি, দুঃখ করে জানিয়েছিলেন, "এক এক সময় এমন ঝামেলা হয় যে মুখাগ্নি করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হই, গরীবের আর কি করার আছে বাবু?...।" মধ্য বাংলার এক হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার এক মহিলা জানালেন "আমাদের আজকাল প্রায় ২০-২৫ মাইল দূরে নিয়ে যেতে হচ্ছে।" এক সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "মুখাগ্নি করে সমাধিস্থ, মানে কবর দিলে কোন ধর্মীয় আপত্তি নেই নিশ্চয়ই?" একজন জানালেন যে, 'দু' একজন তার চেষ্টা করলেও তাতেও বাধা আসছে।" আর একজন জানালেন, "এ নিয়ে আরও ভাবা দরকার। শ্মশানেই আমাদের সমাধিস্থ করা যায় কিনা দেখা দরকার। শ্মশানগুলো যে কিভাবে দেশের শত্রু হয়ে যাচ্ছে, তা তো বুঝতে পারি না।" এই যে শ্যামলবাবুদের রক্তে গড়া শ্মশান, শিব মন্দির, অন্য মন্দির, ফুলের বাগান, মা-বাবা-ভাই-বোন-এর স্মৃতিতে তৈরি স্মৃতিস্তম্ভগুলো গত কয়েকবছরে বার কয়েক নষ্ট করা হয়। আবার এই দেবতুল্য মানুষগুলো সবই নিজের রক্তে ও খরচায় ঠিক করছেন সবকিছু। হাজী সাহেবের মত দুএকজন বাদে কেউই এগিয়ে আসেনি। আমার এক ধর্মপ্রাণ ইরানী বন্ধু কতবার ক্ষমা চেয়ে গেছে, কয়েকশ বছর আগে নাদির শা হিন্দুদের অত্যাচার করেছে, মন্দির

ভেঙেছে বলে। সে অনুতপ্ত। যেন কয়েকশ বছর ধরে সে গ্লানি বহন করে চলেছে! এমনকি আমাদের নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ অনুতপ্ত হয়ে সে নিজের কবরস্থানের পাশে শিবমন্দির তৈরি করে গেছেন। আর আমরা?

আমাদের আশ্রমের আশেপাশে যেন দেবদেবীর মেলা বসেছে। মেলা নয় রাজসভা, এখানেই লক্ষ্মীবাবুর সঙ্গে আলাপ। তাড়া খেয়ে পালিয়েছিলেন ওদিকে। ব্যাঙ্কে ভালো কাজ করতেন। তারপর কার ডাকে এসে থেকে গেছেন। কিছু অনাথ-এর নাথ হবার আশায়। ঝামেলা হয়েছে অনেক। তবে ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করে থেকে গেছেন বটগাছের মত, অনাথ শিশুদের কল্যাণে। এই শিশুরাই অনেকে ইস্কুল থেকে পাশ করে বিয়ে থা করে নিজেরাই ছোট গাছ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেশে আগে অনেক জমিদার ও মধ্যবিত্তের শহরে বাড়ি থাকলে সেখানে অনেক দূরের বা নিম্নবিত্ত বাড়ির ছেলেমেয়েরা এদের বাড়িতে থেকে নিখরচায় পড়াশুনা করত। কিন্তু দেশভাগের পর এরা অনেকেই সবকিছু ফেলে ভারতে পালিয়ে যায়। তাদের যা ক্ষতি তা তো হয়েছেই, তার সঙ্গে সমস্যা বেড়েছে এই নিম্নবিত্তদের ও দূরের গ্রামবাসীদের। এদের জায়গায় নতুন কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি এদের দরকার মেটাবার জন্য। দেশে এখনও যাদের পুরনো আমলের বাড়ি আছে তারা যথাসাধ্য করে যাচ্ছেন। ঢাকায় উয়ারীতে নিতাইবাবুর বাড়িতে সবসময়ই দেখছি আট-দশজন পড়ুয়া অতিথি। চট্টগ্রামে আলীদার বাড়িতে দেখেছি জনা দুই অতিথি। সিলেটে চৌধুরীদের বাড়িতেও তাই। মাদারীপুরে আমার দাদু-দিদিমার বাড়িতে সবসময় কিছু পড়ুয়া থাকত। বরিশালে কাকার বাড়িতে সেইরকম। আজকাল হলে বলতাম মিনি ছাত্রাবাস।

নিতাইবাবুর বাড়িতে গিয়েই মনে পড়েছিল আমেরিকায় আমার বন্ধু, দুই দেব-দেবী, এ্যান্‌ডী ও বেকীর কথা। এ্যান্‌ডী হচ্ছে স্কুল মাস্টার আর এলিজাবেথ (বেকী) হচ্ছে সাইকোলজিষ্ট। পুরোপুরি শাকাহারী। সেটা অন্য কথা। দূরের গ্রামে তাদের বাড়ি। বাড়ি না বলে আশ্রম বলা চলে, বা কমিউন। আরও কে কে যেন আছে। "এসো আমার চার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই", বেকী বলে। এ্যান (অন্নপূর্ণা), ন্যাব (নবারুণ), ধী (ধীরাজ) ও ক্রীস (কৃষ্ণ)।" দুজন আমাদের মত কালো এবং দুজন সাদা এবং কালো দুজন যেন একটু অসুস্থ বা অস্বাভাবিক। এ্যান ও ধী ওকে দেখিয়ে বলল, "আমার ওই দুই সন্তান খুব লাকী ওর জন্ম তোমাদের দেশে। ওরা একটু রিটার্ডেড। চারুসেবা অরফ্যানেজ থেকে অ্যাডপট করেছি, কি রকম স্মার্ট দেখেছ? কিড্‌স আর সো হ্যাপী। আমরা সবাই কত খুশি।" চোখে না দেখলে অনেক কিছুই বিশ্বাস করা যায় না। আগে জানতাম বিদেশে অনেক "চাইল্ড ওবুজ", শিশু পীড়ন হয়, আমাদের মত কালোদের মানুষ করে চাকর-বাকর-ঝি করে এবং আরও কত কি! শিশু পীড়ন হয় ঠিকই, তবে এই সংজ্ঞায় আমাদের প্রায় প্রত্যেক মা-বাবাই এই শিশু পীড়নের দায়ে দায়ী হবেন। এর ওপর যদি জোর করে বিয়ে দেয়ার কথা ধরা হয় তো আর কথাই নেই! আমেরিকায় হলে আমাদের অনেকেরই হাতকড়া পড়তে হত। আমি নিজে অন্তত এক ডজন পরিবারকে চিনি যারা অনাথদের নাথ হয়েছেন এবং কোন এক পরিবারেও নিজেদের সন্তান (যদি থাকে) ও পালিত সন্তানের মধ্যে বিন্দুমাত্র তফাৎ করতে দেখিনি। খৃস্টীয় চার্চগুলো মনুষ্যত্বের এই দিকটা যে কিভাবে বিকশিত করেছে তা আমাদের শেখার ব্যাপার। আমি আমেরিকায় কয়েকটি পরিবারকে জানি যারা একাধিক অসুস্থ শিশু তারা

মানুষ করেছেন এবং হাসি মুখে। এনারা দেবতুল্য নন। সাক্ষাৎ দেব ও দেবী, মর্তে ভগবান। এক বিন্দু কম নন। এই দেবতাদের পরিশ্রমে আমেরিকায় সাহিত্যিক, টেনিসের গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম বিজেতা, অলিম্পিকের সোনা বিজেতা থেকে কংগ্রেসম্যান এমন কি প্রেসিডেন্টও হয়েছেন। আমাদের পৌরাণিক বই-এ এর অনেক উদাহরণ আছে। রামায়ণের সীতাই তো পালিতা এবং মহাভারতের কর্ণ? এ থেকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদেরকে অনেক কিছু শেখাতে চেয়েছিলেন, সেগুলো কি আমরা পেরেছি? আমাদের অনেকের আপত্তি এই অনাথ শিশুদের বিদেশীরা বিধর্মী করছে। কিন্তু আমাদেরই সন্তানরা ফরাসী, জার্মান বা ইংরেজ হয়ে মানুষ হলে আমরাই বলি, "সাধু সাধু।" গরীব শিশুরা দেশের পতিতালয়ে গেলে বা উটের পিঠ থেকে পড়ে মারা গেলে কি আমাদের মাথা ব্যথা?

এই তো ক'বছর আগে দেশের এক নামকরা দরদী আমলা মেমো-টেমো লিখে অমলবাবুর আশ্রমে অনাথদের জন্য যে সাহায্য আসত তা বন্ধ করলেন। কিন্তু আমরা জানি সেই বিখ্যাত উক্তি, "অনাচার দেখলে যুগে যুগে আমি আবির্ভাব হব।" তাই আবির্ভাব হয়েছিলেন অমলবাবু, নোয়াখালীর ঝরণাদি, কুমিল্লার হাজী সাহেব, চট্টগ্রামের মীরাদি ও আরও অনেকে। অমলবাবুরা অনাথদের বাঁচাবার জন্য কষ্টার্জিত আয়ের সবটাই দিতেন। বৌদি হাসিমুখে জানিয়েছিলেন, "ভগবান দেখেছেন।" তবে মাসের পর মাস বাড়িতে আলুসিদ্ধ-ভাত উঠেছে সেটা অবশ্য বৌদি জানাননি। সেই আমলা সাহেবের অবশ্য সন্ধান পাওয়া যায়নি যখন একদল নরপশু অন্য এক পুরনো আশ্রমের অশীতিপর স্বাধীনতা সংগ্রামী বৃদ্ধকে পিটিয়ে বলে, "তুই এখান থেকে যা। এটা তোর দেশ নয়।" বৃদ্ধ রামবাবু কিন্তু একবারও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে একটাও খারাপ কথা বলেননি, তবে আশ্রমও ছাড়েননি, শুধু জানান, "এই তো আমার দেশ আমার স্বর্গ।" ক'দিন আগে সেই আশ্রমের একটা ছাত্রাবাস পোড়ানো হল। সেই আমলা তখনও আসেননি, এখনও নীরব। আমরাও তো এর নীরব সমর্থক। "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা সবে যেন তৃণ সম দহে।" কিন্তু স্বর্গের পথে তো পা বাড়াতেই হবে। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমাদের মাঝেই আছেন এই দেব-দেবীরা, তাঁরাই আমাদের ভবিষ্যৎ, তাঁরাই আমাদের ভরসা।

স্বর্গের সন্ধানে : দেশ বাংলা

দেশে একটা কথা আছে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী"। আবার এটাও অনেকে বলেন যে, "দেশই হচ্ছে স্বর্গ"। তাই সুযোগ পেলেই স্বর্গের সন্ধানে বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াই। এবারও প্ল্যান ছিল ৯২-৯৩-এর ডিসেম্বর-জানুয়ারির ছুটিতে দেশে ঘুরব। মেদিনীপুর থেকে চট্টগ্রাম, হওড়া থেকে সিলেট, বীরভূম থেকে বরিশাল, ও মাঝের অন্যান্য শহর ও গ্রাম।

বিদেশের কাজ সেরে যথারীতিই কলকাতা এসে পৌঁছাই। এরোপ্লেনটা কলকাতায় না দাঁড়িয়ে প্রথমেই ব্যাঙ্কক চলে যায়। পাইলট জানিয়েছিলেন যে, কলকাতায় কার্ফু। আমরা কেউই তা বিশ্বাস করিনি। তবে এর ক'ঘণ্টা পর যখন কাস্টমস্-ইমিগ্রেসন-এর গন্ডী পার হয়ে স্বর্গের মাটিতে পা দিলাম তখন আর বুঝতে বাকি ছিল না কলকাতার অবস্থা অবশ্যই স্বর্গ নয়। কার্ফুর বাজারে একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল ঠিকই, তবে খোলাবাজারে জোগান ও চাহিদার নীতি অনুযায়ী অনেক বেশি গুণ ভাড়া চাইল। তাতে রাজী হলাম, কিন্তু রাজী হলাম না যখন ইউনিফর্ম পরা কলকাতা পুলিশ একটা মোটা অঙ্ক ঘুষ চাইল। একেবারে আন্তর্জাতিক "আগমনের" সামনে দাঁড়িয়েই। আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করে ড্রাইভারবাবু নিজেই পুলিশকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এত টাকা চাইছ কেন?" চাঁচাছোলা উত্তর, "জানেন না আজ বড়বাবুদের বেশি টাকা দিতে হবে? কারফিউর দিনে গাড়িতে উঠতে দিচ্ছি এই তো বাপের ভাগ্যি!"—বলে একটু দূরে পুলিশের এক বড়বাবুকে দেখিয়ে দিল। এর একটা রফা হতেই আরেক দালাল অ-মানুষ হাজির। সেও আবার মোটা টাকা চায়। আবার ঝগড়া। ড্রাইভারবাবুর আবার একই প্রশ্ন এই জোর করে টাকা নেওয়ার ব্যাপারে। এবারের উত্তর "আমি ইউনিয়নের। ইউনিয়নকে টাকা দিতে হবে। পুলিস ও পার্টিকে। কেন আপনি নতুন নাকি যে এসব জানেন না?" এর সঙ্গে তিনি বাঙালীদের বর্ণবাদী প্রথায় ড্রাইভারবাবুকে ধ্রাতানি দিলেন "তুই শালা বিহারী আবার আসবি না এয়ারপোর্টে; তখন দেখে নেব ঝামেলা করলে।" সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে," ভাবলাম। না-খাটা বাঙালী খেটে-খাওয়া "ছোটলোক" বিহারীদের ওপর এখনও ছড়ি ঘুরিয়ে যাচ্ছে। এই ক'বছরের এক্সটরশন কালচার বা পরগাছা সমাজনীতি বোধহয় আরও পাকাপোক্ত হয়েছে। চাষী থেকে মাস্টার, ঝাড়ুদার থেকে ডাক্তার সবার ছেলেমেয়েরাই হতে চায় পরগাছা এক্সটরশননিষ্ঠ, দালাল (মিডল ম্যান), গুণ্ডা, দাঙ্গাবাজ। চাষ করে, ছেলে পড়িয়ে, শ্রম দিয়ে, ঝাড়ু দিয়ে বা ডাক্তারিতে পয়সা অনেক কম।

কারফিউর কল্যাণে ছুটি পেলাম ক'দিন। কিন্তু ছুটির মধ্যেই খবরও পেলাম, দাঙ্গা হচ্ছে। দাঙ্গা অর্থে হিন্দু-মুসলমান দুজনেই মসজিদ-মন্দির ভাঙছে। এই ভারতে, এই কলকাতায়, এই স্বর্গে। এও খবর পেলাম যে বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধী, পোগ্রোম চলছে। সেখানে

সরকার-বুদ্ধিজীবীর সহায়তায় এক তরফাভাবে চলে হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধী গণহত্যা, গণধ্বংস, গণধর্ষণ, গণখেদানো—অর্থাৎ পোগ্রোম। ইদানীং বাংলাদেশের কাগজেও এই দাঙ্গা না-হওয়ার চারিত্রিক ব্যাপার নিয়ে লিখেছেন পূরবী বসু। শামসুর রহমান, আবুল মোমেন ও আরও কয়েকজন। দাঙ্গা হওয়া অতি খারাপ জিনিষ, তবে তার মধ্যেও একটা গণতান্ত্রিক ব্যাপার আছে। অর্থাৎ কোন সমাজে যদি সংখ্যালঘুরা মনে করে তাদের কোন গণতান্ত্রিক অধিকারই নেই—পুলিশ, মিলিটারী, আমলা, সংবাদপত্র, বিচার বিভাগ কেউই তাদেরকে সামান্যতম সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না, তা হলে সেখানে হবে পোগ্রোম। কিন্তু যদি মনে করে এর কেউ কেউ তাদের পাশে দাঁড়াবে তাহলেই তারা প্রয়োজনে সংখ্যাগুরুর বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে পারে। যা ভারতে হয়। হয় আমেরিকা, ফ্রান্স, শ্রীলংকায়। হয় না পাকিস্তানে, বাংলাদেশে, ইরানে, সুদানে, বার্মায়। হয় নি স্তালিনের সোভিয়েত ইউনিয়নে, হিটলারের জার্মানীতে, ও আরও অনেক জায়গায়। এ নিয়ে সৈয়দ সাহাবুদ্দীন থেকে আসগার আলী ইন্‌জিনিয়ার ও শামসুর রাহমান-এর সঙ্গে কিছু আলাপ আলোচনা হয়েছে।

কলকাতায় নেতারা বলে চললেন "তেমন কিছুই হয় নি", কিন্তু সপ্তাহভরে কারফিউ চলল। মিথ্যা প্রচার চলল। গুজবও বাড়ল। ক'দিন পরে এক নেতা সরাসরি আমাকে বললেন, "মন্দির-মস্‌জিদ ভাঙার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।" "কোথাও কিছু হয় নি। কাগজওয়ালারা মিথ্যা বলছে।" আরেক নেতা বললেন, "সাম্প্রদায়িকরা বাংলাদেশ-পাকিস্তানের ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলছে। এদেশেও মুসলমানেরা কোন মন্দির ভাঙে নি।" ইনি আবার আমাদের স্বর্গের নগরীর সব নেতার মতই হিন্দু বাংলাদেশী-ভারতীয় (বাংলাদেশী-ইণ্ডিয়ান)। এবং তিনি এতই নাস্তিক ও অসাম্প্রদায়িক যে তার "স্বর্গাদপী গরীয়সী" মাতৃভূমির মুসলমান ও নমঃশূদ্র হিন্দুদের সঙ্গে বাস করলেন না! সে কথা পরে। কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, সমাজবাদী সব শেয়ালেরই এক রা। ধর্মবাদী হিন্দু ও মুসলমানদের কথা আলাদা। তারা তো সরাসরি বলেই দিচ্ছেন যে, তারা একে অন্যের সঙ্গে থাকতে পারেন না। কিন্তু আমাদের শাসককুলের এই মিথ্যা কার স্বার্থে? সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরুর স্বার্থে? বন্ধুদের আমন্ত্রণে কসবা, ট্যাংরা, থেকে মেটিয়াবুরুজ নিজেই দেখেছি। কিন্তু আমাদের যারা শাসন করছেন তারা দেখলেন না কেন? জানলেনই বা না কেন? বিদেশে থাকাকালীনই তো সেখানকার টেলিভিশন, খবরের কাগজে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ-আফগানিস্তানের মন্দির ভাঙা ও ভারতের মসজিদ ভাঙার খবর দেখেছি, পড়েছি। কলকাতার খবরও। তাছাড়া স্যাটেলাইট-এর যুগে টেলিফোন ও ফ্যাক্স-এ সব খবরই তো মুহূর্তের মধ্যে অন্য জায়গায় চলে যায়, এছাড়া লাইভ-টিভি থাকায় সত্য কতদূর ঢাকা যায়? সাত-ই ডিসেম্বরেই আমার এক করাচীর বন্ধু ফোন করে জানায় সেদেশে কিছু হিন্দুকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। বিশ্বাস হয় নি। আট তারিখে আম্মানের জর্ডন টাইমস্-এর প্রথম পাতাতেই অন্যান্য খবরের মধ্যে সে খবরও ছিল। সাত তারিখ থেকেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, কুমিল্লা থেকে আত্মীয় ও বন্ধুরা জানিয়েছে তাদের বাড়ি, ব্যবসা, জমির ধান পুড়ছে। ভোলায় তাদেরকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে রাখা হচ্ছে। তাদের মন্দির-উপাসনালয়-আশ্রম-শ্মশান ধ্বংস হচ্ছে। কিন্তু নেতারা কেন বললেন, "সব ঠিক"? বিশেষত যারা দেশ-পরিত্যাগ করে এসেছেন সেইসব হিন্দু বাংলাদেশী-ভারতীয়রা। কলকাতার কয়েকজন হিন্দু মুসলমান জানালেন যে তারা নেতাদের সেখানকার খবর জানালেও তাদেরকে সাহায্য করার

ব্যাপারে সবাই নারাজ। ঢাকাতেও সেই কথাই শুনেছি।

স্বর্গের সন্ধানে নগরীর পূবদিকে যখন যাই, দাঙ্গাপীড়িত এলাকার বেশ কয়েকজন মুসলমান আমাকে এক মুসলমান সাংবাদিক ভেবে তাদের অসুবিধার কথা অনেক জানালেন, আবার একটু দূরে গৃহহীন কিছু হিন্দু আমাকে কোন এক নেতার আত্মীয় ভেবে অনেক কথা শোনালেন। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যখন সবাই "ওদের" প্রতি দোষারোপ করছে তখন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজনীতিবিদ্ পুলিশ বুদ্ধিজীবীরা নীরব। আরও দুঃখের কথা যে, এদেরই অভিযোগ যে তাদের পাশে এসে দাঁড়াননি কোন মন্ত্রী, রাজ্যপাল, সাংসদ (মমতা ব্যানার্জী বাদে), এম-এল-এ, পুলিশ কমিশনার, কাউন্সিলার। মেটিয়াবুরুজের এক হিন্দু ভদ্রলোক যার বাড়ি, ব্যবসা, ও মন্দির মুসলমান বর্ণবাদীরা পুড়িয়ে শেষ করেছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমি তো মুসলমানদের সঙ্গেই থাকি, কিন্তু আমার বাড়িঘর পুড়ল কেন? কেন গণেশের মূর্তি নর্দমায় ফেলা হল?" ট্যাংরায় এক মুসলমান ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হিন্দু বর্ণবাদীদের মত সেই একই প্রশ্ন। কুমিল্লার অশীতিপর বৃদ্ধ দাসবাবু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ও কুমিল্লার গ্রামের স্কুলের প্রাক্তন হেডমাস্টার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কেন আপনারা বললেন, এখানে আমরা সব ঠিক আছি? এই দাঙ্গার সময় আমাকে পিটিয়ে পিটিয়ে শেষ করে দিয়েছিল। ক'দিন অজ্ঞান হয়েছিলাম। কি করে বেঁচেছি জানিনা। ওদিকে যাবার কথা কোনদিন ভাবিনি। আমার স্বর্গের দেশে পড়ে আছি। আমি তো "হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই"তে বিশ্বাস করি। তাই তাদের সঙ্গেই আছি।" দাসবাবুর বাড়িতেই তার দুই মুসলমান ছাত্র থেকে পড়াশুনা করে যা আগের সোনার বাংলায় খুবই দেখা যেত। ওখানেই পাশ থেকে একজন আমাকেই জিজ্ঞাসা করে, ...কিন্তু আমাদেরকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে আর আপনারা আমাদেরকে দেখতে আসা তো দূরে থাক, আমাদের বড় সাহেবদের "ধন্যবাদ" জানাবেন; সেটা কি রকম নারকীয় কথা?"

দেশ-বাংলা ঃ কাপুরুষ

চলন্তিকা অভিধানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কাপুরুষ কথার অর্থ হল "যাহার পুরুষোচিত সাহস নাই" অথবা "যে ভয়ে কর্তব্য বা আত্মসম্মান বিসর্জন করে"। অর্থাৎ আমাদের মত পুরুষ যারা তাদের সাহস আছে, ভয় নাই। কর্তব্যের জ্ঞান আছে, এবং আমরা আত্মসম্মান বিসর্জন দিই না। সত্যিই কি তাই? আগেও ভেবেছি, এখনও ভাবি। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার তো মনে হয় এটা নারীদের পক্ষ্যেই প্রযোজ্য, পুরুষদের জন্য একেবারেই নয়। ব্যতিক্রম অবশ্য সব কিছুতেই থাকে। অর্থে পুরুষালী কথার অর্থই হওয়া উচিত যাদের সাহস নেই, আত্মসম্মান তাড়াতাড়ি বিসর্জন দেয়, কর্তব্যে ভয় এবং নারী অর্থে হওয়া উচিত তার উল্টো-সাহসী, কর্তব্যপরায়ণ, আত্মসম্মান আছে। তাই কাপুরুষ কথাটা, সত্যি হওয়া উচিত ছিল না-নারী, কা-নারী বা না-স্ত্রী এই ধরনের একটা কিছু। ব্যাকরণ জানা পণ্ডিত গিন্নি বা পণ্ডিত মশাইরা দয়া করে শব্দটা জানাবেন। কলকাতার দাঙ্গা-ক্ষতিগ্রস্ত পাড়াগুলো ও বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ঘুরে (১৯৯২-৯৩) কথাটা আবার মনে পড়ে গেল তাই লিখছি।

আমাদের বাংলাদেশে কাপুরুষ কথাটার মানে গোড়া থেকেই উল্টো হওয়া উচিত ছিল। যদি ধরে নিই আমাদের পূজো-পার্বণ হাজার হাজার বছর ধরে সমাজে কি হচ্ছে বা হয়েছে তারই একটা সামাজিক প্রতিচ্ছবি, তাহলে কবে আমাদের বীরত্ব বা সাহসের পরিচয় দিয়েছে আমাদের পুরুষ বা দেবতারা? সাহস তো দেখিয়েছেন দেবী দুর্গা বা মা কালী। শক্তির পূজারী বলেই না মা কালী, মা দুর্গার পূজো করছে বাঙালীরা। এছাড়া বাঙালীর পূজো বলে আর যা আছে সবাই দেবী; মা লক্ষ্মী, মা মনসা। এছাড়া যা একটু আধটু পূজো পেয়েছে সে তো বাবা ভোলানাথ। তবে ভোলানাথকে পাওয়ার চেষ্টা সাহস বা কর্তব্যপরায়ণতার জন্য নিশ্চয়ই নয়। ভোলাবাবার স্ত্রীদের তো সাহসী, কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার কথা। ঐতিহাসিক ও ব্যাকরণবিদরা বলতে পারবেন আমাদের বাংলাদেশে কাপুরুষদের শাসন আরম্ভ হওয়ার পর কবে পুরুষরা না-নারী (কা-নারী, না-স্ত্রী) কথাটা হাইজাক করে কাপুরুষ কথাটা চাপিয়ে দিয়েছেন। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলারা তাদের ও তাদের পরিবারকে আগলে রাখার চেষ্টা করেছেন ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তা দেখলে মনে হয় পুরুষরা যদি নারী সম হতে পারত তাহলে সমাজের খুব লাভ হত। তবে ওইসব আমার দেখা জায়গায় পুরুষরা অবশ্যই মহিলাদের সঙ্গে আছেন তা বলাই বাহুল্য। এছাড়া গত দু শতকে অনেক বাঙালী মণীষী মহিলাসম ছিলেন এ কথা আমাদের সবারই জানা; তাদের মধ্যে; রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ডিরোজিও, দেশবন্ধু, লালন, রামকৃষ্ণ, নজরুল, বিবেকানন্দ, নেতাজী ও আরও অনেকের মধ্যে মাত্র কয়েকজন।

এই সামান্য অল্প ক'দিন আগে দেশের এক বীরাঙ্গনার কথা মনে পড়ল। ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ দেশের প্রায় প্রত্যেক কাগজে এই খবর বের হয়। একটি কাগজে খবরটা এইরকম ছাপা হয়।

পুলিশের কাছে আব্দুস শহীদ ঘটনার যে বর্ণনা দেয় তা খুবই পৈশাচিক ও খুবই নির্মম।

নৌকার মাঝি আব্দুস শহীদের ডান পা নেই। পঙ্গু অবস্থায় নৌকা চালিয়েই তার জীবিকা চলে। ঘটনার দিন অর্থাৎ ৫ই সেপ্টেম্বর আব্দুস শহীদকে মাধবপুর ঘাট থেকে মাত্র দু'শ টাকায় ভাড়া করা হয়। তাকে বলা হয়েছিল নিদারাবাদ থেকে কিছু আনতে হবে। খুনের ঘটনার মূল আসামী তাজুল ইসলাম তাকে ভাড়া করে।

পুলিশের কাছে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে নৌকার মাঝি আব্দুস শহীদ জানান, 'নিদারাবাদে নৌকা লাগিয়ে বসে আছি। রাত তখন একটা হবে। হঠাৎ দেখি ১৫/২০ জনের এই দলটি বিরজাবালা ও তার পাঁচ সন্তানকে এনে নৌকায় তুলল। ভয়ে তারা জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছিল। তাদের কারও পরনে কাপড় ছিল! কারও পরনে কাপড় ছিল না। আমাকে নৌকা চালাতে বলা হল। আমিও ভয় পেয়ে গেলাম। নৌকাটি পৌঁছল ঘটনাস্থল ধোপাজুড়ি বিলে। আগেই সেখানে ড্রামে চুন ও লবন রাখা ছিল। ঘাতকরা ওদেরকে নৌকা থেকে বিলের তীরে নামাল। আমি নৌকায় বসে রইলাম হঠাৎ দেখি বিরজাবালাকে কেটে ফেলার জন্য তারা উদ্যত হল। বিরজাবালা কাঁদলেন উচ্চরবে। ঘাতকদের পাও জড়িয়ে ধরেছিলেন বার বার। ঘাতকরা বিরজাবালাকে কুপিয়ে হত্যা করে ড্রামে ঢুকাল। এরপর বড় মেয়েকে (নিয়তি) কাটল। দূর থেকে দেখলাম ছোট ছেলেমেয়েরা বাঁচার জন্য যে কি ফরিয়াদ করছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমার চোখ বেয়ে দরদর করে পানি পড়ল। খোদাকে ডাকলাম। হে আল্লাহ, আমাকে কেন এখানে আনলে? আমার মাথা ঘুরছিল। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। ঘাতকরা দুটি ড্রাম বিলেই পুঁতে রেখে আমাকে নৌকা চালাতে বলল।

এই সময় বিরজাবালা দেবী ছাড়াও নিয়তি (১৭ বছর), প্রণতি (১৩), সুভাষ (১৩), সুমন (৭) ও সুজনকে (৩) কেটে টুকরো টুকরো করে ড্রামে ঢোকানো হয়। এর দুবছর আগে বিরজাদেবীর স্বামী শশাঙ্ক দেবনাথকে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যেতে বলা হয় এবং তিনি না গেলে শশাঙ্ক বাবুকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করা হয়। বারবার হুমকি সত্ত্বেও স্বর্গাদপী মাতৃভূমি ছাড়েন নি। দেশপ্রেমের জন্য যদি কোন সৌধ গড়তে হয় সে তো গড়া দরকার দেবনাথ পরিবারের বেদীতে। আর আমাদের কাপুরুষ বীরপুরুষ না-নারীরা কি করলেন? কুমিল্লার অনেকেই (পুরুষ) তো এখন বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, পশ্চিমবাংলার হর্তাকর্তা।

এবারে পূর্ব কলকাতায় দেখেছি শ্রীমতী মারুফা বেগম, ফতিমাদেবী ও পদ্মাদেবী তাদের পোড়াঘর সামাল দেবার চেষ্টা করছেন। মেটিয়াবুরুজে রুকমিনি দেবী ও সীতাদেবীই তাদের আগুন লাগা বাড়িঘর পাহারা দিয়েছেন। চট্টগ্রামের তুলসীধামে প্রতিমা মাসীই সব সামলাচ্ছেন পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া আশ্রমটা। গ্রামের পর গ্রামে দেখেছি বৃদ্ধা অনিলাদেবী, বিধবা চান্দিমাসীরাই পাহারা দিচ্ছেন তাদের ভিটা। তারা তো আমারই মা-মাসী। অনেককেই এখন রাজস্থান, বিহার, পশ্চিম বাংলা ও ত্রিপুরাতে ঠেলার চেষ্টা হচ্ছে। এই বীরাঙ্গনারাই সাহস যোগাচ্ছেন তাদের পরিবারদের। কুমিল্লার এক গ্রামে দেখেছি এক মহিলা সম্পূর্ণ ছাই-এর ওপর বসে, কোলে ছেলে

নিয়ে, পান বাছছেন, বাজারে বিক্রি করে দুমুঠো অন্ন যোগাতে হবে তো! চট্টগ্রামের অভয় মিত্র মহাশ্মশানের ডোম পরিবারের মহিলাকেই দেখেছি কি করে সৎকার হবে তার জন্য চিন্তিত। সিলেটের ধ্বংসপ্রাপ্ত শ্মশানের (ডোমপাড়ার) ঘোষদস্তিদার গিন্নীর হাতেই সেটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব এসে পড়েছে মনে হল। সিলেটেরই ভস্মীভূত দুর্গাবাড়ির ঠাকুরের ভগ্নাবশেষ খোঁজ করেছিলেন সেবায়েত আরতীদেবী। ঢাকার শনির আখড়ায় বাড়ি ছিল আশাদেবী (সঙ্গে রিক্সাচালক শুভেন্দুবাবুসহ) বসে ছিলেন ওনার বাড়ি নামক একটা পোড়া মাঠের ওপর। মহাসড়কের ওপর তিনদিন ধরে ভাঙা বিশাল মন্দিরটিতে ফুল দিতে এসেছিলেন বাস্তুহীন রাধারাণীদেবীই। অনেক জায়গাতেই এদের সঙ্গে অবশ্যই ছিল নারী-সম পুরুষরা; স্বামী, ছেলে, বাবা, প্রতিবেশী। ছিলেন না আমাদের না-নারী নেতারা, বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। এই পোগ্রোমের মধ্যেই আমাদের নেতারা ঘুরলেন—বেড়ালেন দেশ-বিদেশে। পাশের দেশের এক বাংলাদেশী ভারতীয় কম্যুনিষ্ট নেতা বিশ্রাম নিলেন সাগরে—চারদিনে পনেরো লক্ষ টাকা খরচ করলেন। অন্য এক প্রদেশের বাংলাদেশী ভারতীয় নেতা ছুটলেন দিল্লী-দরবারে তার ক্ষমতা রাখার জন্য।

অন্যদিকে তথাকথিত ধর্মপ্রেমীরা বনগাঁ ছুটলেন বিদেশের মসজিদ গড়তে। ছুটলেন দেশের মন্দির ভাঙতে। অন্য ধর্মে প্রেমীরা বনগাঁ 'লং মার্চ' ঠেকাতে, অন্নবস্ত্র নিয়ে রিলিফের মার্চ নয়। আরেক দেশের ধর্ম প্রেমীরা ভাঙতে গেলেন দূর (বি) দেশের মসজিদ, গড়তে এলেন না দেশের আরও অনেক পুরনো রমনার মন্দির। গড়তে যাবেনও না গত কয়েক বছরে ভাঙা হাজার হাজার মঠ-মন্দির, বাড়ি, গড়তে আসবেন না ফতিমাদেবী, আশাদেবীর বাড়ি, সুযোগ পেলে তো আমিই 'লং মার্চে' যোগ দিতাম। হিন্দু বা মুসলিম বিদ্বেষবাদে যদিও আমি কোন দিনই মনে করি না উত্তর প্রদেশ বাঙালীদের দেশ। আমার বাংলার দায়-দায়িত্বই সবচেয়ে আগে।

অনেক তথাকথিত প্রগতিশীল পুরুষকে জানি তারা সুযোগ পেলেই নিজেদের পরিচয় গোপন করার জন্য পরেন অন্য পোষাক। ধুতি বা লুঙ্গি ছেড়ে পরেন পশ্চিমা শার্ট-প্যান্ট। কিন্তু তাদেরকেই দেখেছি তারা চান তাদের স্ত্রীদের শাড়ী পরাতে। শাঁখা সিঁদুরসহ। মহিলারা নারী বা নারী সুলভ সাহসিকতার পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করে না। আমাদের পুরুষরা আজকাল যখন বিলেত, আমেরিকা, চীন, আরব-এ বেড়াতে যান তখন অবশ্যই পশ্চিমা পোষাক পরেন, তাদের স্ত্রীরা পশ্চিমা পোষাক পরলে (এখনও কাউকে দেখিনি) এদের মান যায় যদিও এক্ষেত্রে মহিলারা এখনও পুরুষদের ইচ্ছার দাস এবং হসটেজ, জিম্মি। এই শাসক শোষককুল শুধু যে মহিলাদেরই হসটেজ করেনি তাই নয়, এরা রাজনৈতিকভাবে হসটেজ করেছে আমাদের সংখ্যালঘুদেরও। এটা অতি অমানবিক। এদেরই প্রচ্ছন্ন, পরোক্ষ ও ব্যক্তিগত জীবনের কাজকর্মে ভারতে এখন হিন্দুবাদীরা উঠে দাঁড়িয়েছে। তারাই এক দেশকে "ধর্মীয় কর" বলেছেন আর ভারতকে 'ধর্ম নিরপেক্ষ রাখ' বলে চেঁচিয়েছেন। আর আমাদের সোনার দেশের কথা তো জানা। ১৯৪৭ সালে দেশের এক তৃতীয়াংশ ছিল সংখ্যালঘু-হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান, আদিবাসী। মাত্র চল্লিশ বছরে কমে তা প্রায় ১০% মাত্র। পৃথিবীর ছয় নম্বর জনসংখ্যার দেশ থেকে মানুষ কর্পূর-এর মত উধাও হয়ে যাচ্ছে আর কারুর চোখেও পড়ছে না? সৌভাগ্য যে যারা নিজেদের হিন্দু বলেন তাদের একাধারে সহনশীলতা ও সংকীর্ণতার ফলে তাদের কোন গোষ্ঠীগত পরিচয় নেই। তবে ভয় হয় যতই তারা

না-ধর্মী হবেন —যার প্রভাব শহরে অনেক—ততই আবার গোষ্ঠীগত পরিচয় না বাড়ে। তাহলে পদার্থবিদ্যার নিয়ম, 'টু এভরি একশ্যন দেয়ার ইজ এ্যান ইকুয়াল এণ্ড অপোজিট রিয়্যাকশন' (যে কোন ক্রিয়ার তার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া হবে) এর প্রকোপে পড়লে সবারই মুসকিল, বিশেষত পশ্চিমবাংলার সংখ্যালঘুদের। এর থেকে ত্রাণ পেতে গেলে তা নিয়ে বলা, লেখা দরকার।

সংখ্যালঘুদের হসটেজ করে নয়। দাঙ্গা ও পোগ্রোম-এর সময় মহিলাদের পরিবারের মান, সম্মান, সাহস, পরিচয়ই যোগাতে হয় না। তাদের আরেক রকম নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচারিত হতে হয় অর্থাৎ ধর্ষণ। আমরা পুরুষরা না-নারীর মত ধর্ষণ তো করিই, যারা ধর্ষণ করে তাদেরও রক্ষা করি। "চোরে চোরে মাসতুতো ভাই"। এটা অতি দুঃখের বিষয় যে, দুই বাংলাতেই ধর্ষণ বাড়ছে। বাংলাদেশে সাধারণ সময় ও পোগ্রোমের সময় মুসলিম ও সংখ্যালঘু ধর্ষিতা হচ্ছেন হাজারে হাজারে। বাংলাদেশে ১৯৯২-এর পোগ্রোমের সময় সাংসদদের হিসাব অনুযায়ী ২,৬০০ জন ধর্ষিতা হয়েছেন। তবে এবারে আমাদের দেশ বাংলায় বোধ হয় একটা না-নারী সম নারী বিরোধী নতুন অধ্যায় যুক্ত হল। এবারই প্রথম দেশে নারী যখন সরকারের প্রধান তখনই এই গণ ধর্ষণ হল। প্রধানমন্ত্রী তাদের পাশে দাঁড়ালেন না। এলেন না বিরোধী দলের নেত্রী। আমাদের কলকাতা ত্রিপুরার বাংলাদেশ-এর সমাজসেবীরা তাদের জন্য পুরনো দু-একটা ছেঁড়া শাড়ী-কাপড়ও পাঠালেন না, ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। কলকাতায় অবশ্য সাংসদ মমতা ব্যানার্জী এক ধর্ষিতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এছাড়া ঢাকা-চট্টগ্রামের কিছু মহিলা এবং পুরুষ। এই উদাহরণ বেশিদিন চলতে থাকলে বাংলা ভাষায় হয়ত নতুন কোন শব্দ সংযোজন করতে হবে। না-নারীর বদলে। তবে ভরসা এই যে, নারীরা সাধারণভাবে সহনশীল, বিচক্ষণ, সাহসী এবং সমাজের রক্ষয়িত্রী। সেই সমাজ থেকেই মা দুর্গার আবির্ভাব ঘটে এবং আশা রাখি আবারও তাঁর আবির্ভাব ঘটবে।

হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই

১৯৯২-এর কলকাতার দাঙ্গার পরে দেখি সবাই কতবড় অসাম্প্রদায়িক, কত কম বর্ণবাদী তা বোঝাবার জন্য হয় বড় বড় হরফে দেয়ালে লিখে যাচ্ছে, অথবা সেই রকম বলে যাচ্ছে। তার ওপর সবাই দূর হিন্দী, ভোজপুরী, পাঞ্জাবী বা মারাঠিভাষী দেশের জন্য অত্যন্ত শঙ্কিত দেখলাম, কিন্তু তার নিজের চোদ্দপুরুষের বাংলার জন্য অত্যন্ত নির্বিকার। সে কম্যুনিস্ট, ডান, বাম, নকশাল; কংগ্রেস-আদি-নতুন জনতা, সমাজবাদী ও বিপ্লবী দল, এবং বিজেপি থেকে মুসলিম লীগ সবাই। এর সঙ্গে অনেকে জানাচ্ছিলেন তারা কত বড় ধর্মবিরোধী ও নাস্তিক। অনেকেই হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃত্বের কথা জানাচ্ছিলেন, এবং ধর্ম যারা পছন্দ করেন তাদেরকে হেয় করার চেষ্টা করছিলেন। ধর্ম যারা পছন্দ করেন তাদের বক্তব্য জলবৎ পরিস্কার। কিন্তু তারাই বড় সাম্প্রদায়িক না কংগ্রেস, কম্যুনিস্টরা বড় সাম্প্রদায়িক তা ভেবে দেখার দরকার আছে। আমার মনে হয় খোলাখুলি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অনেক সহজ রেখে ঢেকে গোপন বর্ণবাদীতার বদলে। আফ্রিকায় বর্ণবাদবিরোধীরা এটাই বলতেন। পশ্চিমবাংলা-ত্রিপুরা বা দিল্লীর অনেক শাসক, শোষক, আমলা, বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশী-ভারতীয় (হিন্দু, অন্য অর্থে বাঙালা) তারা যদি সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষ বা নাস্তিক, মার্কসবাদী-সমাজবাদী বা গান্ধীবাদী হন তো তারা তাদের দেশ ছাড়লেন কেন? আমাদের মুসলিম বা নমঃশুদ্র (দেশের অধিকাংশ হিন্দু) প্রতিবেশীর সঙ্গেই তো থাকার দরকার ছিল। এদের দেশ ত্যাগের কারণ একটাই। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান, (আদিবাসী-সহ) উদ্বাস্তুদের কথা অবশ্যই আলাদা। তবে প্রাণের ভয়ে পালানো উদ্বাস্তু রাজনীতিবিদ বা বুদ্ধিজীবীরাই বা কি রকমের লোক? তাদের আত্মীয়-পড়শী যারা জন্মভূমির স্বর্গে পড়ে রইলেন তাদের জন্যই বা কি করলেন? দেশের মুসলিম বুদ্ধিজীবী, যারা সংখ্যালঘুদের পাশে এসে দাঁড়ালেন, তাদেরও সমর্থন করলাম না কেন? আসলে আমাদের বাংলাদেশী-ভারতীয় হিন্দুদের প্রকৃত শ্লোগান হল :

হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই,
(কিন্তু) তাদের সঙ্গে থাকা নাই।

এর সঙ্গে সঙ্গে বড় গলায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কথা বলা। "চোরের মায়ের বড় গলা?" এনাদের ঘরে ফেরার কথা বলাটাও অন্যায়, যদিও সবাই লুপ্ত, সুপ্ত, বর্জিত সাম্প্রদায়িকতার ওপর সবসময় লিখছেন, বলছেন। বাংলাদেশে ১৯৯২-৯৩-এর পোগ্রোমের সময় আমি নিজেই দেখেছি শ'য়ে শ'য়ে বাড়ি, মন্দির, শ্মশান, আশ্রম, গ্রন্থাগার, ব্যবসা ধ্বংস। দেখেছি নিঃস্ব স্ত্রী, পুরুষ, শিশু। দেখেছি এই বাংলা বাদে, দেশ-বিদেশের মানুষের প্রতিবাদ। আমার কি এই গণধ্বংসের সঙ্গে হাত মেলাচ্চি? এটাও এক রকমের সাম্প্রদায়িকতা নয়? আমরা যেন প্রগতির নামে শবের ওপর বসে ধ্যান করছি নিজের মোক্ষলাভের জন্য। কিন্তু শবটা কার? অবশ্যই নিজের নয়। ভগবান,

যীশু, হাসান-হুসেন বা গান্ধীজী আমাদের আদর্শ নয়। আদর্শ নয় দধীচি। নিজের অস্থি? বাঙালীদের ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ করতে দূরদেশী, অ-বাঙালী গান্ধীজী ছুটেছিলেন নোয়াখালী, গিয়েছিলেন কলকাতায়। আমাদের গান্ধীবাদী থেকে মার্কসবাদী, নাস্তিক থেকে আস্তিক হিন্দুরা করলেন ঠিক তার উল্টো। মুসলমান ও গরীব হিন্দুদের ফেলে আগেভাগে ছুটলেন অন্যদিকে, হিন্দু ভারতে, পশ্চিমবাংলায়, ত্রিপুরায়। এনারাই বানালেন ভারতকে হিন্দুস্তান, পশ্চিমবাংলাকে হিন্দু বাংলা। এনারা যদি দেশে থাকতেন, প্রতিবাদ করতেন, তাহলে দুই বাংলার সমাজ এবং শাসককুল এতদূর বর্ণবাদী হত কি?

মা-দিদিমার কাছে আমাদের পুরনো কাব্যের অনেক ছল-চাতুরীর গল্প শুনেছি। সেগুলো শেখানো হত যাতে আমরা তা না করি। কিন্তু আমরা হিন্দু বাঙালীরা বোধহয় উল্টোটাই শিখছি। এবারে বাংলাদেশের পোগ্রোমের পর পশ্চিমবাংলাবাসী সিলেটের এক বিপ্লবী আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বলেছিলাম, সেখানে অনেক পরিবার একেবারে অসহায় অবস্থায় কাটাচ্ছেন, বিশেষতঃ শহরের ধ্বংসপ্রাপ্ত জুমালা প্রাসাদ শ্মশান-সংলগ্ন কয়েকটি ডোম পরিবার। অপূর্ববাবু, বনানীদেবী, রামরামবাবুদের পরিবার সাহায্য চেয়েছিলেন শ্মশানটি সারাবার জন্য যেখানে বিপ্লবীবাবুদের কয়েক বংশের সৎকার করা হয়। শ্মশানের আশেপাশে কুড়ি পঁচিশটা মন্দির ও স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙা হয়েছিল, দাহ করার জায়গা ছারখার, এর অনেক আগেই শ্মশানের এক বিরাট অংশ গোরস্থানে পরিণত। বিপ্লবীবাবুর উত্তরটা এখানে লেখা যাবে না। ওনার বক্তব্য আর পাঁচজন বুদ্ধিজীবীর মতই বলে আমি মনে করি। আমরা অনেকেই পশ্চিমবাংলা-ত্রিপুরা আসার খুব ভাল কারণ দেখাই, সবাই অসাম্প্রদায়িক। যেমন : কার পূর্বপুরুষ কলকাতার স্বপ্ন দেখেছিলেন তাই, কার কক্সবাজার থেকে বড় শহরে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল তাই সোনামুড়ায় হাজির, কেউ এত বিপ্লবী ছিলেন যে তার মা-বাবা জোর করে বালুরঘাটে পাঠিয়ে দেন; কেউ কাকার সঙ্গে বেড়াতে এসে আর ফিরতে পারলেন না; কেউ আবার বিলেত থেকে পড়া শেষ করে রংপুরে যাওয়ার পথে পাত্রী পক্ষের কাছে কিডন্যাপ্ট হয়ে মেদিনীপুরে থেকে গেলেন; ইত্যাদি। এরা বাংলাদেশী বা নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশী নন কেন? যদি বহু বছর পরে গায়ানার বা ইংলন্ডের ভারতীয়রা "ভারতীয়" বা নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান হয়, তবে যার কয়েক চোদ্দ পুরুষের দেশ রাজশাহী বা নোয়াখালী সে অনাবাসী বাংলাদেশী বা এন. আর. বি. (NRB) নন কেন? এ ব্যাপারে হিন্দু ও হিন্দুস্তান-বিদ্বেষী পাকিস্তানী বিহারী মুসলমান বা মোহাজীররাও আমাদের থেকে ভাল। তারা নিজেদের ভারতীয় বলতে অতটা সঙ্কোচ বোধ করে না। তারা তাদের দেশে বেড়াতে আসতেও ভালবাসেন, দেশের ভাল মন্দতে সম্মতি ও আপত্তিও জানায়।

এবারে বাংলাদেশে পোগ্রোমে এক হিসেবমতে অন্তত দু লক্ষ হিন্দু-বৌদ্ধ গৃহহীন হয়েছিল, তিরিশ হাজারের মত বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মানুষ-ঘর-বাড়ি, ব্যবসা, মন্দির-মঠ-বিহার-গির্জা, শষ্য-মাছ-গরু বাছুর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ চালানো হয়েছিল শ্মশানগুলোর ওপর। মালাউনের দাহ করাও অপরাধ। এই সময়েই দেখেছি কুমিল্লার টিক্কার চর, চট্টগ্রামের বৈদ্যুতিক চুল্লী ও অভয় মিত্র শ্মশান ধ্বংস। এছাড়া আগেও দেখেছি অন্য কয়েকটা শ্মশান। ঢাকায় যারা ইদানীং সৎকারে গেছেন তারা জানেন সেখানের অবস্থা কি। বাংলাদেশের মুসলিম-নামের বুদ্ধিজীবীদের অনেকে এ নিয়ে খোলাখুলি সমালোচনা করেছেন ও করছেন। আমি কয়েক জায়গায়

কয়েকটি নামকরা ডোম পরিবার, সাধু ও অন্য হিন্দু-বৌদ্ধ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কবর দেওয়ায় তাদের আপত্তি কোথায়। দু-একজন জানিয়েছিলেন, "আমাদের আপত্তি না থাকলেও নির্যাতনকারীদের তাতেও আপত্তি।" এক গরীব পরিবার জানিয়েছিলেন যে, "কবরও যখন দিতে পারি না তখন মুখাগ্নি করে গঙ্গাজল ছিটিয়ে জলে ভাসিয়ে দিই।"

আমাদের বাংলা ও বাঙালীর আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা দেখে এক আরব অধ্যাপক একটি আরব্য প্রবাদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ঃ "যদি কেউ মল দ্বারা আবৃত থাকে, এবং তা যদি তাকে আরাম দেয়, তাহলে এটাই তার যোগ্য প্রাপ্য।" নেতা-বুদ্ধিজীবীরা আরাম পেলে আর আমার বলার কি আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কি এটা প্রাপ্য হতে পারে?

আবার রাজা ও রেজার সঙ্গে দেখা

রাজা ও রেজা দুজনেই আমার বেশ চেনা। দুজনেই আমাকে কাকু বলে ডাকে, আবার দুজনেই দুজনের খুব বন্ধু—যাকে হরিহর আত্মা বলে আর কি। ওদের সঙ্গে দেখা হলে আমার ওপারের এক মানিকজোড়-এর কথা মনে পড়ে—সমীর আচার্য্য এবং সামীর আওলাদ। রাজা ও রেজার বয়স একই, এবং একই গ্রামে জন্ম, দুই নিম্নবিত্ত পরিবারে। পড়াশুনাতে দুজনেই তুখোর। এবং স্কুলে-কলেজে স্থান পেয়েছে কেউ আগে বা পরে। কিন্তু রাজা ও রেজা যতই হরিহর আত্মা হোক না কেন, সমাজ তাদের আত্মা নিয়েই টানাটানি করেছে—তাদের অজান্তে এবং বিনা অনুমতিতে। ১৯৯২-এর ডিসেম্বর ও ১৯৯৩-এর জানুয়ারিতে দেখা যখন দেশে হিন্দু ও সংখ্যালঘু-বিদ্বেষী দাঙ্গার প্রকোপ প্রশমিত হয়নি, এবং যখন বড় মাপের আক্রমণ কমলেও ছোট মাপের আক্রমণ তখনও চলছে। প্রথমে দেখা দুই পরিবারের সঙ্গে শহরে, এবং লেখাটা সেই ব্যাপারেই। যদিও ওদের দুজনকেই বেশ বিচলিত দেখলাম, তাদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে মনে হল যেন তারা দুই গ্রহ বা দুই সম্পূর্ণ আলাদা দেশ থেকে এসেছে। সেটা কেন হচ্ছে সেটাই আমার জিজ্ঞাস্য আমাদের সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, আমলা, রাজনীতিবিদ ও শাসক-শোষকদের। আমরা কি মিথ্যা বা ধাপ্পার আশ্রয় নিচ্ছি? এর ফল ভাল না খারাপ?

এক পরিবারে নিমন্ত্রণে আলোচনার সময় প্রায় সবাই ঐকই স্বরে জানালেন, "দেশে কিছুই হয় নি," আর "যা হয়েছে (দাঙ্গা) তা' ভারতেই হয়েছে—উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র বা পশ্চিমবাংলায়।" একমাত্র রেজা ও তার ছোট বোন বাসন্তী ছাড়া। ওরা মাঝেমধ্যে আপত্তি জানাল এবং বাসন্তী রেগেমেগে গিয়ে জানাল যে ওদের কোন সংগঠন যেন অত্যাচারের ছবি দিয়ে একটা বই বার করছে। ওরা গুরুজনদের থেকে কোন পাত্তা পেল না। সে বাড়িতে অতিথিদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন যারা দেশে বেশ প্রতিপত্তিশালী। ওরাও জানালেন, "না, তেমন কিছুই হয় নি।"

রাজার বাড়িতে গিয়ে দেখি প্রায় জনসমুদ্র, ওই ছোট ফ্ল্যাটেই। গ্রামের থেকে এসেছেন। প্রথমে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তার খোঁজই পাই নি বলা উচিৎ। গোড়ায় সত্যিই খুঁজে পাই নি। প্রথমে বিতাড়ন, পরে লুট ও তারপর আগুন। ওদের পরিবারের ১৭ জন মহিলার মধ্যে দুজন নিখোঁজ হয়েছিলেন অনিচ্ছায়, এবং এ কথা পুলিশ ডায়রিও করবে না। এ ব্যাপার প্রথমে বাসন্তীই আমাকে জানায়, তখন কিন্তু বিশ্বাস করিনি। বাসন্তীর গুরুজনেরা বলেছিলেন, "এটা তেমন কিছু নয়।" আমরা অত্যাচারী পুরুষরা যে অন্য অত্যাচারী পুরুষদের রক্ষা করব তাতে আর নতুন কি আছে। "চোরে চোরে মাসতুতো ভাই"। কিন্তু বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসে এই প্রথম যে যখন এক নারী আমাদের দেশের প্রধান (যা আমাদের অত্যন্ত গর্বের বস্তু) তখনই অগণিত (হিন্দু) মেয়েদের ধর্ষণ করা হল সংঘঠিত ভাবে, এবং একজন অত্যাচারীরও শাস্তি হল না, শিরচ্ছেদ হল

না। এটাও ঠিক আমাদের "স্বাভাবিক অবস্থায়" মুসলিম-অমুসলিম সবাই ধর্ষিতা হচ্ছেন দুবাংলাতেই। পৃথিবীর কোন সমাজব্যবস্থাই কি ধর্মবাদী, কি গণতান্ত্রিক ধর্ষণকে সমর্থন করে না। আমাদের এশিয়া মহাদেশেই অনেক ধর্মবাদী দেশ আছে যেখানে ধর্ষণ-এর শাস্তি হচ্ছে শিরচ্ছেদ।

বাংলাদেশে যা দেখেছি সেটা দাঙ্গা নয় পোগ্রোম। দাঙ্গা অর্থে দু দলের, অনেক সময় অসম মারামারি : যা হচ্ছে জেলায়-জেলায়, কলেজে, পাড়ায়-পাড়ায়, রাজনৈতিক দলের মধ্যে, গুণ্ডাদের মধ্যে। দুঃখজনকভাবে দাঙ্গা নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে পাকিস্তানে, যুগোশ্লাভিয়াতে, শ্রীলংকায়, জর্জিয়ায়, আজারবাইজানে, আমেরিকাতে, ভারতে। এ নিয়ে বাংলাদেশের পত্র পত্রিকাতেই লিখেছেন অনেকে। ১৯৯২-এ ভারতের কলকাতায় আমি নিজে দেখেছি দাঙ্গায় মন্দির ভাঙা, হিন্দু বস্তি পোড়ানো। যেমন দেখেছি ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদ ও মুসলিম বস্তি। এর আগেও দেখেছি এ ধরণের অপমানকর ঘটনা। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা দাঙ্গার সময় মসজিদ ভেঙেছে তা দেখিনি, দেখতে চাই-ও না, এবং এই ধরনের অপকর্মের কথা চিন্তা করলে তাকে সর্বাগ্রে আমিই বাধা দেব।

দু পরিবারই জানত যে ক'দিন আগে আমি কলকাতায় ছিলাম। তারা সেখানকার খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানলেন। রেজার পরিবার জানল যে তারা ভারতে দাঙ্গার চালচিত্র ভিডিও, টিভিতে দেখেছেন, এবং আমাকেও দেখালেন। কলকাতা-সহ ভারতে হিন্দুদের কুকীর্তি সেদেশে হিন্দুদের বাড়িতেই দেখেছি। এছাড়া অনেক পত্রিকা ও জার্নাল ছবি-সহ বিশেষ সংখ্যা ছেপেছে। ওনারাও তা দেখেছেন জানালেন। কিন্তু বাংলাদেশে ওই রকম কোন ভিডিও বা খবর দেখেন নি জানালেন, যদিও দেশে প্রায় প্রত্যেক উদারপন্থী কাগজ অনেক লেখালেখি করছেন (এবং এর কয়েক মাসের মধ্যে অন্তত আধ ডজন বই বেরিয়েছে)। রাজার পরিবারের অবস্থা দেখলাম অতি মর্মান্তিক। দেখলাম বাংলাদেশে ভিডিও (পরে সর্বমোট তিন এলাকার তিনটে ভিডিও দেখেছি)। জেলায় জেলায় দেখলাম পোড়া গ্রাম, ব্যবসা, মন্দির, আশ্রম, ছাত্রাবাস, শ্মশান অগণিত গৃহহীন মানুষ ও পোড়া বাড়ি। রাজার বাড়ির কয়েকজন শুধু চোখের জলই ফেললেন। অনেকে শাসিয়ে গেছেন অন্যদের এ কথা না জানাতে। "আমাকে ধর্ষণ করছে" বা "আমার বাড়ি পোড়াচ্ছে" বলাটাও নাকি অন্যায়। মজার কথা, কলকাতার এক বাংলাদেশী ভারতীয় (হিন্দু) সাংবাদিকও জানালেন যে, বাংলাদেশের "ওসব কথা না লেখাই ভাল" কারণ তাহলে নাকি তিনি সেক্যুলার ও বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত হবেন না!

দেশভাগের পর থেকেই আমাদের রাজনীতিবিদ ও ধর্মব্যবসায়ীরা দেশের সংখ্যালঘুদের হসটেজ বা জিম্মি করে রেখেছেন। "ভারতে হলে এখানে হবে" এই অযুক্তি মাঝে মধ্যে অনেকেই খাড়া করেন, বিশেষত খারাপটা। ভালোটা নয়। নয় কেন একজন সংখ্যালঘু, দেশের রাষ্ট্রপতি বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিদেশ মন্ত্রী, জাতিসংঘের প্রধান, রাষ্ট্রদূত, উপাচার্য্য, পুলিশ, সেনাবাহিনী, ব্যাঙ্ক প্রধান। নয় কেন ঝাড়দার, পিওন, প্রধান মন্ত্রীর সচিব। সংখ্যালঘু বা আদিবাসীর জন্য প্রদেশ, স্বায়ত্তশাসন। কেন সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরুর থেকে অধিক হারে বাড়ে না। এবারের পোগ্রোমের পর আমাদের ধর্মবাদীরা অতি সাফল্যের সঙ্গে ভারতে, বিশেষত কলকাতা ও পশ্চিমবাংলায়, যা করতে পেরেছেন

তা হল সেখানে অনেকে এখন বলছেন বাংলাদেশে (ও পাকিস্তানে) হলে এখানেও হবে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ধর্মীয় রাষ্ট্র হলে আমাদেরই বা তাতে দোষ কি? পাকিস্তান তো প্রায় সব সংখ্যালঘুকে বিতাড়ন করছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ সংখ্যালঘুই এখন ভারতের গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, বস্তিতে, জঙ্গলে, বেশ্যাপাড়ায়, ফুটপাতে। তাহলে ভারত থেকে সমস্ত সংখ্যালঘু বিতাড়িত হলে দোষ কি? তাতে আমরা খুশী হব? তাদের ফিরিয়ে নেব? দেশভাগের সময় বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা ছিল প্রায় এক তৃতীয়াংশ। ১৯৯০-এর আদমসুমারী মতে মাত্র ১০% শতাংশ। মানুষগুলো উঠে যাচ্ছেন কোথায়? ইচ্ছে করে তো কেউ তার চোদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ছাড়ে না। এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা দরকার। দেশের সাহসী সাংবাদিক, চিন্তাবিদ, লেখক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারকদের জানাই শুভেচ্ছা।

অঘটন আজও ঘটে

অঘটন যে আজও ঘটে এই লেখা তারই কয়েকটা নমুনা মাত্র। আমাদের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক না-ঘটনা হয়ে যায় "অঘটন", তবে আমাদের সমাজ যদি স্থিতিশীল, সহনশীল, স্বাভাবিক হত তা হলে আমাদের এই "অঘটন-এর" বর্ণনা একটা খেলো ব্যাপার এর নমুনা মাত্র হত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এবং বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের পর দেশে যে সমাজ তৈরি হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই "সামাজিক বিপ্লব"। মুজিব হত্যার সঙ্গে সঙ্গে দেশের হিন্দু—নিপীড়ন-নির্যাতন একটা সরকারী-বেসরকারী আনুষ্ঠানিক রূপ পায়। হিন্দুদের সঙ্গে ভাগের সঙ্গী হয় বৌদ্ধ-খৃস্টান-আদিবাসী সমাজ, ও অসাম্প্রদায়িক এবং খোলামনের মুসলিমরা। দেশের বন্ধু মুসলিম নামের লেখক, কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, কলামনিস্ট এই নিপীড়ন নির্যাতন নিধন নিয়ে লিখেছেন, এছাড়া আছেন বহু হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান নামেরও লেখক-লেখিকা। তবে লেখনী স্তব্ধ পশ্চিমবাংলার তথাকথিত সেকুলার, নাস্তিক, ডান-বাম-কমুনিস্ট বাংলাদেশী-ভারতীয়রা, যারা পূর্ববঙ্গীয় বা বাঙাল নামেই বেশি পরিচিত। অমি এক মুহূর্তের জন্যও মনে করি না এরা সত্যি অসাম্প্রদায়িক। সেকুলার হলে তো তারা নিজের দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে থাকতেন, এবং সেই কারণেই তাদের পরের প্রজন্ম হিন্দুস্থান ছেড়ে মুসলিম অধ্যুষিত নিজের দেশে ফেরার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। থাক সে কথা। এই নিপীড়ন-নির্যাতনের একটা অংশ হচ্ছে হিন্দুদের মঠ-মন্দির-গির্জা-বিহার আক্রমণ ও ধ্বংস, এবং দেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘুর বাড়ি-জমি-পুকুর-ক্ষেত শত্রু-সম্পত্তি আইনের মিথ্যা প্রয়োগে দখল করা। এর ফল অকাল মৃত্যু অথবা নীরবে বিদেশ পলায়ন, অথবা অনিচ্ছায় নাম ও পরিচয় পরিবর্তন। তবে এই ক'দিন আগে যখন গ্রামে গ্রামে ঘুরছি তখন কয়েকজন সামান্য মানুষ যা করছেন দেখলাম তা আমার কাছে সামাজিক বিপ্লবের মত লেগেছে। তারই কয়েকটা লিখছি।

গ্রামের নাম লক্ষ্মণকাঠি। বাংলার একটি অতি সাধারণ গ্রাম, আম-কাঁঠাল-সুপারী-চালতা -নারকল গাছে ভরা প্রত্যেক বাড়ির আশেপাশে এক বা একাধিক পুকুর। এক সময়ে এখানে থাকতেন বহু ঘোষ-বোস-দাস-ভট্টাচার্য-রায়-নন্দী-দত্ত-কুণ্ডু-হালদার পরিবার। প্রায় প্রত্যেক বছরই দাঙ্গা হয়েছে ১৯৫০-এর পর থেকে, বিশেষত মধ্যবিত্ত বা লেখাপড়া জানা পরিবারের ওপর আক্রমণ এসেছে। আস্তে আস্তে প্রায় সবাই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। তবে এই খণ্ড গ্রামের জল-মাটি-মানুষ উর্বর হলেও গ্রামের বিশেষ পরিচিতি ছিল এখানকার পঞ্চদশ শতাব্দীর বিষ্ণু মন্দির। এটি একটি কালো কষ্টি পাথরের মূর্তি। কথিত আছে যে স্বপ্নাদেশে একটা পুকুর খুঁড়ে এই গ্র্যানাইটের মূর্তিটি পাওয়া যায়। মূর্তির দুটো চোখ রূপো দিয়ে বাঁধানো ছিল, তবে তার একটি চোখের সাদা রূপো জ্বলজ্বল করছে এখন। অন্যটির রূপো এখন আর নেই। আরও বলা হয় যে পুকুরটি দুটি গ্রামের

মাঝে ছিল, এবং খনন করার আগেই দুই গ্রামের মাঝে সমঝোতা হয় যে মূর্তিটি যে গ্রামের দিকে পড়বে সেই গ্রামেই এই মন্দির স্থাপিত হবে, এবং যেহেতু খনন করার সময় এটা লক্ষ্মণকাঠির দিকে পরে তাই এই মন্দির লক্ষ্মণকাঠির সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়।

এই গ্রামে একটি কালী মন্দিরও ছিল। ২০০-৩০০ বছরের পুরনো কিন্তু দেশ ভাগ ও হিন্দু বিতাড়নের সময় এটি হিন্দু-বিদ্বেষীদের রোষানলে পরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে কাল দেবতা এটির অকাল মৃত্যু ঘটায়। এখন অবশিষ্ট আছে কয়েকটি ইট মাত্র। বিষ্ণু মন্দিরটির প্রায় সেই অবস্থা হয়েছিল, শুধু কষ্ঠিপাথরের মূর্তিটি নিজের বলেই দাঁড়িয়েছিল। মন্দির দালান আর ছিল না, তবে কয়েকটি অতি গরীব হিন্দু পরিবার মূর্তিটির ওপরে খড়ের ছাউনী দিয়ে মন্দির" বাঁচিয়ে রেখেছিল। গত কয়েক বছর ধরে সেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া পরিবারগুলির একটি পরিবারের কয়েকজন মাঝে মধ্যেই বিদেশ থেকে এসে দেখে যাচ্ছিলেন, এবং বছর দশেক আগে সেই পরিবারের এক ছেলে এই বিষ্ণু মন্দিরটি পুনঃনির্মাণ করেন। পাকা দালান বাড়িতে মন্দিরটি স্থাপিত হয়। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অরাজনৈতিক সাধারণ মানুষ, মন্দির এলাকায় বড় আকারে বৈশাখী মেলা শুরু করে দেন। ইতিমধ্যে মন্দির পুনঃনির্মাণের পরও সেই চলে যাওয়া পরিবারের লোকজন একাধিকবার গ্রাম দেখতে আসায় মন্দিরের পরিচর্যায়-রত গরীব পরিবারের উৎখাত বন্ধ হয়ে যায়। এই উৎখাত প্রবণতা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য গরীব হিন্দু পরিবারেরা অঙ্গীকার করে যে তারা তো দেশ ছেড়ে পালাবেনই না, তদোপরি সেই ২৫০ বছরের পুরনো ভেঙে দেওয়া কালী মন্দিরটি এই বিষ্ণু মন্দিরের পাশেই পুনঃনির্মাণ করা হবে। এই দুইটি মন্দির নিয়ে একটি নতুন তীর্থস্থান গড়বে তারা! এরা সঙ্গে পেয়েছে কয়েকটি অল্পবয়সী মুসলিম যুবক, যারা তাদের সাহায্য করছেন, এবং হিন্দু-বিদ্বেষীদের চোখে এরাও কাফের। গ্রামের গঙ্গাধর ঢালি আমাকে জানালেন, "এই বছরখানেক আমরা যে কি আনন্দে আছি তা বলতে পারব না বাবু। বছরখানেক হল আমরা এক কমিটি করেছি এগুলি ঠিক করার। দুবেলা খেতে না পেলেও এখন অত কষ্ট হয় না।" সুন্দর শার্ট-প্যান্ট পরা একটি স্মার্ট অল্প বয়সী যুবক এসে বলে, "স্যার আমি আশরাফ জামাল। আমি কমিটির সম্পাদক। এটা আমাদের একটা সামাজিক প্রকল্প। আপনি কিন্তু আমাদের লোক, আপনার পরিবারকে আমরা চা-ই চাই। আপনি কিন্তু লক্ষ্মণকাঠির অন্য সবাইকে বলবেন আমাদের প্রকল্পের কথা।"

অন্য অঘটন এর নাম মহিলারা। এককালে এখানে থাকতেন প্রচুর সেনগুপ্ত, দাসগুপ্ত, দত্তগুপ্ত, সেনশর্মা ও সেন ও আরও অনেক নামের বৈদ্য পরিবার। এখন অবশ্য তাদের খুঁজে পেতে কষ্ট হয়। বেশ ক'বছর ধরে সে গ্রামেও নিয়মিত যাচ্ছি। ১৯৯৪-এর গরমে সঙ্গে ছিল আমার মেজদি ও আমার ১৫ বছরের ছেলে শুভ। এ গ্রামের অনেক সুখ্যাতি ছিল। গ্রামের হাইস্কুল থেকে অনেকে স্ট্যাণ্ড করত। এ গ্রামে আছে একটা শিখর দেউলের স্টাইলে প্রাচীন মঠ। এটি মুসলমানী আমলে তৈরি করেছিলেন দয়ারাম সরকার প্রায় ৩৫০ বছর আগে। মঠটি ৩০-৪০ ফুট উঁচু এবং এটি হেলানো বা লিনিং (leaning)। তাই এটিকে অনেকে সরকার দেউল বা হেলানো মঠ বলে। এই মঠটির ওপরও অনেক আক্রমণ হয়েছে, এবং এটিকে আগলে রেখেছেন রাখাল সাধু ও তার বিধবা মা। এদের মাসিক আয় একশ টাকাও নয়, তবুও মুখে হাসি ছাড়া কথা নেই। রাখাল ১৫

বছর আগে পোষাক বলতে একটি চটের আলখাল্লা পড়ত, এবার দেখলাম সেটি একটি নেংটিতে ঠেকেছে। রাখালবাবুর পড়শীরা তার সঙ্গে আছে।

গতবার দেখেছিলাম মঠটি ধ্বংস হতে বসেছে। খবর নিয়ে জানলাম যে রাখালরা সারাতে গেলে সরকার-মাতব্বর-মঠ বিরোধীরা তা করতে দেয়নি, কারণ সেটা নাকি সরকারের কাজ। উদ্দেশ্য অবশ্যই সকলের জানা। আমরা তো নাকি এখন "তাদের লোক" তাই যখনই যাই তখনই নেংটি থেকে লুঙ্গি শাড়ি থেকে থান পড়া সবাই ছুটে আসে। সেবার ফেরবার মুখে সবার একযোগে প্রার্থনা, "বাবু এটিকে একটু বাঁচাবার চেষ্টা করুন না হলে আমাদের সব শেষ হয়ে যাবে।" বলেছিলাম, "অতদূর থেকে তা কি করে সম্ভব?" উপজেলা ও জেলা ও জেলা শহর এবং ঢাকায় আমার চেনা-পরিচিত পদস্থ লোক, আমলা, রাজনীতিবিদ্‌দের কাছে রাখালবাবুদের আর্জি জানাই। বেশিরভাগ লোকই শুধু হেসেছিল, আর অন্য কয়েকজন বলেছিল, "আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?" তবুও দেশে ফিরে গিয়ে অতগুলো লোকের অনুরোধ ভুলতে পারি নি। ১৯৯৪ ও ১৯৯৫-এ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে পুলিশ সুপার থেকে পূরাতাত্ত্বিক মন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি সবাইকেই লিখিতভাবে অনুরোধ জানাই। অবশেষে ১৯৯৬-এর জুলাই এর গোড়ায় এক শুভ মুহূর্তে সরকার থেকে লিখিত একটি উত্তর পেলাম যে "মঠটি ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে সারানো হবে।" প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করিনি। অবশেষে পত্রদাতা কাজী সাহেবকে ফোনে যোগাযোগ করি। সহানুভূতিশীল ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক তো কম নেই!

ক'দিন আগে যখন মঠে ঢুকছি তখন মনে হল যেন যেন কোন মেলা ভেঙেছে। অনেক লোক, বাসের রাস্তার দিকে এগোচ্ছে। এগিয়ে দেখি নাম সংকীর্তন ভেঙেছে, এদিকে ওদিকের গ্রাম থেকে সব গরীব মহিলা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে কান্না জুড়ে দিলেন, রাখালবাবু হাতটা শক্ত করে ধরে বলেন, "বাবু, আমরা সবাই এখানে আছি, আর থাকব। মন্দিরটা সারানো হচ্ছে জেনে আমরা ভরসা পাচ্ছি। এখন আমরা নিয়মিত নাম সংকীর্তন শুরু করেছি।" কথা বলার মাঝেই দেখি সব কীর্তনীয়া ও হরিনামের দল দুহাত তুলে "হরি বোল, হরি বোল" শুরু করল। দুজন "আমার নিজের লোক" দুদিক থেকে এসে আমার হাত ধরে তাদের দলে টেনে নিয়ে ঢাকের তালে নাচতে শুরু করল।

"...আছি হেথায়, থাকব নিশ্চয়;
(আমার) দেশ, গ্রাম, মঠ, পূজা-পার্বণ-দোল
ডাকি হিন্দু-মুসলমান-কৃষ্ট, ভাই বোন সবায়
বলে সবে দু হাত তুলে, হরি বোল হরি বোল।"

পূর্বাঞ্চল—বাংলাদেশ

ইদানীংকালে বাংলাদেশ-পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা ও পূর্বাঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য, এক দেশের ওপর দিয়ে অন্য দেশে বা নিজের দেশের অন্য জায়গায় যাতায়াত-এর সুবিধা অসুবিধার কথা লেখালেখি হচ্ছে ও বলা হচ্ছে। এ ছাড়া দুদেশের মধ্যে ট্যুরিজম বা পর্যটন-এর সম্ভাবনা নিয়েও বলা-লেখা হচ্ছে এবং এর অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কথাও বলাবলি হচ্ছে। তবে দুঃখের বিষয় যে এ নিয়ে বলতে হচ্ছে যা ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর-মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় পঞ্চাশ থেকে দেড়শ বছর আগেই তারা তাদের উন্নতির জন্য মেনে নিয়েছে। ইউরোপ খ্যাত ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে চেপে এক দেশ থেকে আরেক দেশ পেরিয়ে চতুর্থ দেশে অনেকদিন ধরেই লোকেরা যাতায়াত করছে। পশ্চিম আফ্রিকায় নাইজেরিয়া থেকে লাইব্রেরিয়া লোক চলাচল করেছিল বড় একটা ঝামেলা না সামলেই (এখানকার গৃহযুদ্ধ অবশ্য অন্য কথা)। গত বছর বেড়াবার সময় ডেনমার্ক, সুইডেন বা নরওয়ের সীমানাই খুঁজে পাইনি। তেমনি নেদারল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সে যাওয়ার সময় কোথায় যে বেলজিয়াম হারিয়ে গেল তা গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবতে হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও সংবিধান প্রণেতারা দেশের রাজ্য এবং জেলা ও শহরকে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন দিলেও ব্যবসা বাণিজ্য ও জনগণের যাতে অবাধ সুযোগ সুবিধা থাকে তার ব্যবস্থা তাঁরা প্রথমেই ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাতে সাধারণ মানুষ যথেষ্ট লাভবান হয়েছেন।

এই ক'দিন আগে অল্প ক'দিনের ব্যবধানে বাংলাদেশ, পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরা গ্রুপ নিয়ে ঘুরে আসি এবং আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে যে আর পাঁচ জন যদি সেইভাবে যাতায়াত করতে পারত তো দুদেশেরই অর্থনীতি লাভবান হত। তবে আমাদের দলের অনেকেই যেহেতু আমেরিকা থেকে আসেন এবং যেহেতু তাদের মালটিপিল-এনট্রি ভিসাতে যাওয়া বা আসার পথ উল্লেখ করা হয় না, তাই এক সীমান্ত দিয়ে ঢুকে অন্য সীমান্ত দিয়ে বার হওয়ার কোন অসুবিধা থাকে না। কিন্তু যেহেতু ভারতীয় বা বাংলাদেশীদের ভিসায় সীমানা পার হওয়ার একটাই পথ লেখা থাকে তাই পর্যটনের ও ব্যবসার অসুবিধা অনেক। এই যাত্রায় আমার সঙ্গে বাংলার ও বাইরের বেশ কয়েকজন যাত্রী ছিলেন যারা বাংলাদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ তীর্থগুলো দর্শনে ইচ্ছুক। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খৃস্টানদের পুণ্য ভূমি। হিন্দুদের ৫১টি পীঠের মধ্যে ৮টি বাংলাদেশে সুগন্ধা, জৈনপুর, করতোয়া তট, জয়ন্তী, ত্রিপুরা (রাধাকিশোরপুর), যশোর, কিরিট দেবী কমলা (এলাহীগঞ্জ) সীতাকুণ্ড, এছাড়া আছে অগুন্তি প্রসিদ্ধ মঠ, মন্দির, আশ্রম শিলাইদহ থেকে সূর্য সেনের বসত বাটি থেকে শ্রীচৈতন্যের গ্রাম। বিগত পঞ্চাশ বছরে সংকীর্ণতাবাদীদের আক্রমণে অনেক জায়গাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কিছু কিছু জায়গা বেশ ভাল অবস্থাতেই আছে। আমার ধারণা পশ্চিমবাংলার লোকেরা যদি সেদেশে নিয়মিত যাতায়াত এবং তীর্থ দর্শনে যান তো

লাভবান হবে দুদেশই। বাংলাদেশ লাভবান যে, সে দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হবে এবং পর্যটনের টাকায় কয়েক হাজার নতুন কাজের সংস্থান অনায়াসে হবে এবং সেদেশে উদার ও মানবতাপন্থী লোকেদের প্রভাব বাড়বে। পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরার সুবিধা যে সে দেশেও বাংলাদেশের লোকেরা অনুরূপ আসবেন। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় লোক কম আসবে এবং অর্থনীতিও চাঙ্গা হবে।

আমরা ত্রিপুরা সীমান্তের দেড় মাইলের মধ্যে আছি জেনে ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি শ্রী কুমার অলোক তড়িৎ গতিতে বার্তা পাঠিয়ে আমাদের আমন্ত্রণ জানান। ফোনে যোগাযোগ করলে পর্যটন বিভাগের উপপ্রধান সমীর সাহাও আমাদেরকে বাংলাদেশের সীমানা টপকে মনোরম ত্রিপুরা দেখতে উৎসাহিত করেন। তবে শঙ্কা ছিল আমাদের বাংলাদেশী যাত্রীদের ভিসার কি হবে। কিন্তু ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের বন্ধুদের আগরতলা সংলগ্ন আখাউড়া সীমান্ত পার হওয়ার ভিসা দেয় এবং আমাদের এই মাঝারি মাপের দলটি নির্ঝঞ্ঝাট-এ সীমানা পার হয়। ত্রিপুরার কর্মকর্তাদের থেকে জানলাম যে তারা ত্রিপুরার উন্নতির স্বার্থে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা, বাণিজ্য এবং পর্যটন বাড়াতে চান। সর্বোপরি সৌহার্দ্য।

আমি প্রায় প্রত্যেক বছরই কাজে-অকাজে পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ঘুরি এবং ত্রিপুরাতে আগেও গিয়েছিলাম, এবারেও গেলাম। বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় ঢুকেই যেন মনে হল একটি পরিচ্ছন্ন, কর্মঠ গরীব দেশ থেকে একটি অতি গরীব, অপরিচ্ছন্ন জায়গায় এসে পড়েছি। ত্রিপুরার ঊনকোটি, উদয়পুর, নীরমহল, আগরতলা, পাহাড়-বন-গ্রাম যেমন আনন্দ দিয়েছে, ঠিক তেমনই তার দারিদ্র্য এবং পশ্চাৎপদতা দুঃখ দিয়েছে। হয়ত আমেরিকা থেকে সীমানা পার হয়ে মেক্সিকোতে ঢুকলে যেমন তফাৎ চোখে পড়ে, বাংলাদেশ-ত্রিপুরার তফাৎটা অনেকটা তার কাছাকাছি। ত্রিপুরার চারপাশের বাংলাদেশের কয়েকটা জেলা যেমন—শ্রীহট্ট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের অনেক লোকের হাতে যথেষ্ট পয়সা, এবং এরা অনেকে অনায়াসে ৫-১০ হাজার টাকা খরচা করতে দ্বিধা করেন না। এছাড়া সেদেশের রাস্তাঘাট পশ্চিমবাংলার তুলনায় অনেক ভাল হওয়ায় ঢাকা থেকে ত্রিপুরার সোনামুড়া ১১০-১২০ কিঃ মিঃ, অনায়াসে দেড়-দু-ঘণ্টায় সারা যায়। এদের একটা ছোট অংশকেও যদি ত্রিপুরারও সৌন্দর্য-আকর্ষণ করে তবে ত্রিপুরারও অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। ব্যবসা, বাণিজ্য, কলকারখানার কথা তো লিখলামও না, যার সম্ভাবনা অফুরন্ত। এছাড়া একটা পরোক্ষ লাভও হতে পারে। বাংলাদেশে যারা সংকীর্ণতায় বিশ্বাসী তারাও একটু পিছিয়ে পড়বেন এবং গণতন্ত্রপন্থীরা সুবিধা পাবেন। এ কথা পশ্চিমবাংলা-বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং পশ্চিমবাংলা থেকে বাংলাদেশের রাস্তাঘাট, কর্মোদ্যম, কাজ করার ইচ্ছা, ওয়ার্ক কালচার অনেক ভাল। আমি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অন্তত দুডজন দেশ ঘুরছি যার অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে ট্রাভেল এণ্ড ট্যুরিজম-এর ওপর। নিউইয়র্কের মত ধনী শহরেও পর্যটন (ট্রাভেল এণ্ড ট্যুরিজম) শিল্প সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান করে। প্রায় দশ বছর আগে লিখেছি, এবং আবারও লিখছি যে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর যদি উত্তর-পূর্ব ভারত-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারত তাহলে হয়ত সে উপমহাদেশের এ্যামস্টারডাম ও রটারডাম (নেদারল্যান্ড-এর) হতে পারত। এ দুটো বন্দর ও নেদারল্যান্ড আজ অন্যতম ধনী দেশ হতে পেরেছে তার প্রধান কারণ এই দুটো

বন্দর মধ্য ইউরোপের জলপথ, সড়কপথ ও রেলপথ-এর শেষ প্রান্ত হতে পেরেছে বলে। কলকাতার পত্তন ও বর্ধন-এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কলকাতারও আরও উন্নতি করা যাবে যদি ভাগীরথীর নাব্যতা বাড়ানো যায়, এবং পশ্চিম বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা যায়।

অন্যদেশের মধ্য দিয়ে নিজের দেশ থেকে নিজের দেশে যাতায়াত করতে দিলে প্রধানত লাভবান হবে ভারতীয় বাঙালীরা যেমন পশ্চিমবাংলা থেকে ত্রিপুরা বা আসামে গেলে। তবে বাংলাদেশের লাভ হবে এই সুবাদে হাজার হাজার লোকের নতুন কর্মসংস্থান এবং ফি বাবাদ লক্ষ লক্ষ টাকা। এছাড়া সিলেট থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম ত্রিপুরার মধ্য দিয়ে যাতায়াতে সুবিধা হতে পারে। যাই হোক, লাভবান হব আমরা বা জনসাধারণ। তাদের সময় ও অর্থ দুইই বাঁচবে, যেমন হয়েছে, আমাদের। তিন দেশের কয়েকজন জানালেন যে, আমিই (আমরাই) হয়ত প্রথম যে ভারত (ত্রিপুরা) থেকে ভারতে (পশ্চিমবাংলা) এলাম একই দিনে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে। আমার মনে হয় আমার আগে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আরও অনেকে এসেছেন। আগরতলা থেকে কলকাতার বিমানের টিকিট না পেয়ে আমি আগরতলা থেকে ঢাকা সড়ক পথে আসি (চার ঘণ্টার মত) এবং ঢাকা থেকে কলকাতা বিমানে আসি। আমাদের বেড়ানোর 'ট্রানজিটে' বাংলাদেশের লাভ হয়েছে থাকা, গাড়ি ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া বাবদ কয়েক হাজার টাকা সর্বোপরি লাভ হয়েছে আমার। আমি একদিনে কলকাতায় আসতে পেরেছি, আরও কয়েকদিন আগরতলায় টিকিটের অপেক্ষায় বসে না থেকে। এটা একটা আহামরি ব্যাপার নয়। ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এ কোন ঘটনাই নয়, এ একেবারে নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। ভারত সরকার আমাদের বাংলাদেশী বন্ধুদের ত্রিপুরা দর্শনে ভিসা দেওয়ায় লাভবান হয়েছে ত্রিপুরা। আমাদের দল সেখানে যত টাকা খরচা করছে তাতে বেশ কয়েকজনের কর্ম সংস্থান হয় (বিদেশে দেখেছি প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি এই রকমভাবেই তাদের দেশ উন্নয়নের হিসাবে দেন) সর্বমোট লাভবান সবাই। ইংরেজীতে বলে উইন-উইন অবস্থা। সবারই মঙ্গল। মুখে যে যাই বলুন সবাই চান দেশের ও দশের মঙ্গল।

মঠ, মন্দির, আখড়া ভরা পুণ্যতীর্থ বাংলা

হাজার হাজার বছর ধরে বাংলায় গড়ে উঠেছে অনেক তীর্থস্থান। এখানে জন্ম নিয়েছেন বহু মুনি, ঋষি, ভিক্ষু ও যুগাবতার মনীষী। এ দেশে আছে বহু হিন্দু-বৌদ্ধ মঠ-মন্দির-বিহার ও উপাসনালয়। আরও আছে বাঙালী মুসলিম সমাজের পীর, দরবেশের মাজার যার মধ্যে শ্রীহট্টের শা জালাল এর মাজার ও তীর্থস্থান অন্যতম। এছাড়া আরও আছে খৃস্টীয় সমাজের অনেক পুরনো গীর্জা ও কবরস্থান।

লোকে বলে বাঙালীর স্বর্ণযুগে বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তিব্বত ও শ্রীলংকায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এবং হিন্দুরা শ্যাম, কম্বোজ, ওংকারধাম ও যবদ্বীপে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করেন বাঙালী প্রচারকরা।

বঙ্গদেশ বহুজাতির দেশ—আর্য, অনার্য মংগোল। এখানকার অনেক পূজা, পার্বণ, মেলা, আচার ভারতের এবং বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে "বাংলাদেশের মন্দির" বইতে শ্রীরতনলাল চক্রবর্তী (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৯৪) লিখেছেন ঃ

"হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান তুলসী গাছ, সেওড়া গাছ ও বটগাছের পূজা প্রকৃতপক্ষে আদিম অধিবাসীদেরই বিশ্বাস উদ্ভূত প্রথা।...প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় কৃষি, শিল্প এক কথায় জীবিকার ক্ষেত্রসমূহকে চিহ্নিত করে যে সব ধর্মীয় চেতনার সূচনা হয়েছিল, তা ক্রমশ লাভ করে সুগঠিত রূপ এবং শুরু হয় তারই পূজা। ...শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানা প্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ড মালিনী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য পূজা ক্রমশ হিন্দুদের ধর্মকর্ম হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অনরূপভাবে রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি অনার্য আদিবাসী বাংলার কোম ও অন্তজ শ্রেণীর অনুষ্ঠান হতে হিন্দু ধর্মে প্রবেশ করে এবং এদের আর্যীকরণ করা হয়। গ্রাম বাংলায় যে সব অঞ্চলে এসব পূজা ও অনুষ্ঠান হত সে-সব পূজাস্থানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে তীর্থস্থান ও দেবালয় গড়ে ওঠে।" (পৃঃ ১২-১৩)

রতনলালবাবু আরও লিখেছেন যে : "বাংলাদেশের প্রধান আরাধ্য বিষয় ছিল শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব" এবং এদের পূজা ও লোকাচার-এর কারণে বাংলাদেশ হিন্দুদের পূণ্যভূমি রূপে পরিণত হয়েছে। দেশ বিদেশের বহু দেশী ও বিদেশী, হিন্দু ও অহিন্দু বাংলাদেশের মঠ-মন্দির-বিহার-আশ্রম জানার উৎসাহ দেখান। সেই জন্য কিছুদিন আগে আমরা কয়েকজন দক্ষিণ, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অল্প কিছু জায়গা ঘুরি, এবং আমাদের অভিজ্ঞতা একাধারে লোকগাথা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ছিল ও যার-পর-নাই আনন্দদায়ক হয়। এর আগে অবশ্য উত্তরবাংলা, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টে গেছি। একাধিকবার।

যাতায়াত, ঘোরাঘুরি থাকা-খাওয়ার সুবিধার্থে বাংলাদেশের তীর্থ দর্শন ছ'টি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ময়মনসিংহ-এর মধ্য বাংলা, খুলনা-যশোর -কুষ্ঠিয়া-র পশ্চিমবাংলা, বরিশাল-ফরিদপুরের জল বাংলা, চট্টগ্রাম-কুমিল্লার দক্ষিণ পূর্ব বাংলা, সিলেট ও উত্তরবাংলা।

সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে

দেশে যতবারই যাই ততবারই এস ওয়াজেদ আলীর লেখা ভারতবর্ষ লেখাটির কথা মনে পড়ে। 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।' হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় বোধহয় এর ওপর একটা প্রশ্নও ছিল। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, ওসবে আমার খুব একটা বড় উৎসাহ ছিল না। তারপরে বি, ই কলেজে ঢোকার পর তো ওসবের দিকে পা বাড়ানোও আইনত নিষিদ্ধ ছিল— সিলেবাসের ধারেকাছেও ওসব ছিল না। শিক্ষা পদ্ধতি আমার এখানকার দেশের মত নয় তো যে ইঞ্জিনিয়ারিং বা স্থাপত্য শিক্ষার সঙ্গে জোড়া থাকবে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইংরেজী মায় বাংলা পর্যন্ত। যাই হোক ওয়াজেদ আলীর ভারতবর্ষের ট্রাডিশনের কথাটা সব সময়ই মনে পড়ে।

দেশে গেলে বি, ই, কলেজে যাওয়ারও চেষ্টা করি। তবে গিয়ে যে সব সময়ে আনন্দ পেয়েছি তা বললে মিথ্যা বলা হবে। যাই তো নস্টালজিয়ার জন্য। চেনাজানা বলতে তো আর কেউ নেই। কম দিন তো হল না সেখান থেকে বেড়িয়েছি। ঠিক সময় বিয়ে করলে তো আমাদের ছেলেমেয়েরাও কারিগর, প্রকৌশল, স্থাপত্যবিদ হতে পারত।

প্রথম গিয়ে উঠেছিলাম গঙ্গার কাছে তেরো নম্বর হোস্টেলে। ডাউনিং-এর পাশে। পাশেই বারো নম্বর। একেবারে আনকোরা নতুন হোস্টেল। আমাদের পাওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে পশ্চিমবাংলা সরকারের কোন এক বড়বাবুর ছেলে এসেছিল, সেইজন্য আমরা নতুন হোস্টেলটা পেয়েছিলাম। আই এসসি পাশ করে যারা আমাদের এক বছর সিনিয়র হয়ে ঢুকেছিল তারা পেয়েছিল পুরনো আমলের ব্যারাক। দেশের এটাই তো নিয়ম। গরমে গঙ্গার পাড়ে হাওয়া খেতে যাওয়া একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। যদিও কলেজটা গঙ্গার পাড়ে হলেও মা গঙ্গার হাওয়ার মাধ্যম ছাড়া বড় কোন যোগাযোগ ছিল না আমাদের। এক এক দিন ব্ল্যাক আউট হলে দুই হোস্টেলের মধ্যে খিস্তির কমপিটিশন চলত। মা-বাবা-ঠাকুরদা থেকে ভবিষ্যতের পুত্র-কন্যা থেকে পাশের ডাউনিং হোস্টেলের সুপার দম্পতি ও তার আট নাবালক-নাবালিকা কেউ বাদ যেত না। এত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রদের এদিকেও যে অত গুণ তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ডিপার্টমেন্ট বা কলেজের সঙ্গে অন্য কোথাও খেলা হলে এই খিস্তি খেউড় সম্রাটদের টাকা দিয়ে ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া হত। অমন মুখ কোথায় পাবি? গেলবার ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে একটি ছেলে বলেছিল, 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে'।

শুনেছি সাহেবদের আমলে হোস্টেলগুলোতে সাদা, কালো, হিন্দু, মুসলমান ভাগ করে দেয়া হত। আমার সৌভাগ্য আমি সবগুলোতেই থেকেছিলাম। তবে স্লেটার থাকার সময় ওই একশ বছরের পুরনো ৩৬ ইঞ্চি স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল থেকে আমার অসম্ভব এলার্জী হত। হাত-পা লাল হয়ে চুলকাত। কিন্তু ঘর পাল্টানো? সরকারী আইনে এখনও সে রকম লেখা নেই। অন্যথায় খুব

মজায় কেটেছে। এক সহপাঠির উৎসাহে বাড়িতে না জানিয়ে, দল মিলে সারারাত ফুটপাতে কাটিয়ে স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা দেখেছি। ভিড়ের চাপে একবার এক বন্ধু প্রায় দম হারিয়ে মারা যাওয়ার উপক্রম। আজকাল?

উলফেনডেন না সেনগুপ্ত ঠিক মনে নেই। খাওয়া দাওয়া দারুণ হত। দুলালদা না কি যেন ডাইনিং হলের ইনচার্জ ছিলেন। মাসে মাসে ডেফিসিট ফেলে ভাল খাওয়াত। আমার একটু অসুবিধাই হচ্ছিল—তখন মা-বাবার বেশি টাকা দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। সবাই সবার কথা জানত, তাই ধার পেতে অসুবিধা হত না। সৌভাগ্য যে কলেজের ফার্স্ট গেট থেকে বেরিয়ে চা-মিষ্টির দোকান পার হয়ে রায় বাবুদের একটা কন্সট্রাকশন কোম্পানী আছে, তাতে একটা পার্ট-টাইম কাজ পেয়ে গেলাম।

১৬ থেকে ২২ বছরের আড়াই হাজার যুবক, আর মাত্র জনা পঁচিশেক মেয়ে। মেয়েগুলোর জীবন, আর যে যে ছেলে ওই মেয়েদের পেছনে লাইন দিত তাদের জীবন অতিষ্ঠ করাই ছিল আমাদের বায়োলজীক্যাল প্রয়োজন মেটাবার বড় ব্যবস্থা। আর পেছনে লাগা হত যে সব ছেলে ডেট করতে বাইরে যেত। অবশ্য প্রয়োজনে একটা সিনেমার টিকিটের প্রতিশ্রুতিতে তার গার্লফ্রেন্ডের মান রক্ষা করার ভারও আমাদের ওপরই ছিল। সে প্রথাটা আজও চলেছে। "পন্‌ডি" (এডাল্ট সেক্স বই, Adult Sex book) এখনও চলছে, তবে এখন আছে ব্লু মুভি ও ড্রাগ মাঝেমাঝে।

ঢোকার সময়েই আমার এক ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য ডিপার্টমেন্টে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ফাইলই আসছিল না। দুবছর পর যখন ফাইল এল, তখন আর দরকার হয়নি। ১৯৮২ সালে আমেরিকার বি, ই, কলেজে এ্যালুমনাই এসোসিয়েশনের কয়েক হাজার ডলারের একটা চেক আমি নিজে অধ্যক্ষ ডঃ শীলের হাতে দিয়ে আসি। তিন বছর পরে গিয়ে শুনলাম যে টাকা এখনও জমা পড়েনি। এখানে ব্যাংকে রাখলে আরও হাজার টাকা পাওয়া যেত সুদ বাবদ। যথা পূর্বং তথা পরম।

আমি থাকাকালীন আমার ব্যাচ একটা অগৌরবের রেকর্ডের অধিকারী হয়েছিল। ঢুকতেই একবার স্ট্রাইক হল। আমরা হাংগার স্ট্রাইক করলাম। কারণটা ভাল জানা ছিল না। তবুও দেশে কোন ঘটনার ওপর বড় একটা লেখালেখি হয় না এবং অবজেকটিভ রিপোর্টিং বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা, বড় একটা হয় না বলে আসল খবর জানা যায় না। কেউ বলেছিল শিবপুরের সিনেমা হলে বি, ই-র ছেলেদের সঙ্গে স্থানীয় ছেলেদের টিকিট নিয়ে ঝগড়া। কেউ বলে, কাছের ব্যানার্জীপাড়াতে নারীঘটিত গার্লফ্রেণ্ড নিয়ে বচসা। যাই হোক ক্লাসও করছিলাম, হাঙ্গার স্ট্রাইকও করছিলাম। কেউই জানত না কেন স্ট্রাইক করছি। আমরা বা পাশের শিবপুর পাড়ার কেউই সঠিক জানে না। পাড়ার লোকেরা জানে আমাদের ধরে প্যাঁদাতে হবে। একদিন পরে জানলাম যে আমাদেরই একজন ও পাড়ার একটি মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। তবে দুজনেরই বক্তব্য এটা বাজে কথা এবং ওরা দু'জনেই স্বেচ্ছায় একটু মাখামাখি করেছে। কিন্তু তার জন্য আমরা কেন না খেয়ে মরব, আর পাড়ার মাস্তানদেরই বা এ নিয়ে এত ঈর্ষা কেন? আসলে আমাদের দেশে বি, ই-র মত কোন ইস্কুলের অবস্থানই হচ্ছে সামাজিক গণ্ডগোলের সূত্রপাত। যে কোন যুবক-যুবতী পরীক্ষা দিয়ে ওই ক্যাম্পাসে ঢুকলেই তার মোটামুটি একটা আর্থিক সঙ্গতি এসে যায়। ঢোকা মানেই এক অন্য ক্লাসের দিকে পা

বাড়ানো এবং আশেপাশের লোকালয় থেকে যাচ্ছে যে তিমিরে সেই তিমিরেই। এটা একটা টেক্সটবুক ক্লাস কনফ্লিক্ট। এর ওপর পাড়ার লোকদের ওই ক্যাম্পাসে ঢোকাও প্রায় অপরাধ। মনে আছে, বার্ষিক রি-ইউনিয়ন, পুনর্মিলন। এক রাতে বাংলা গান, অন্য রাত খেয়াল, আরেক রাত নাটক। পাড়ার লোকেরা কত আঁকপাঁক করত টিকিট পাওয়ার জন্য। ওখানের রীতি এদেশের অবস্থার ঠিক উল্টো। রক্ষে শুধু প্রভাতদার মত কয়েকজন, যারা ওই পাড়া থেকেই নিজগুণে খ্যাত 'মনের মানুষ' পেয়েছিলাম।

ক'সপ্তাহ আগে ১৯৯২ মার্চে দেশে গিয়ে ক'দিন ধরেই ফোন করে যাচ্ছিলাম ডিপার্টমেন্টে। পাইনি একদিনও। অবশেষে সোজাই চলে যাব ঠিক। রোজের মত ভোরবেলা কাগজ এনেছি। 'আনন্দবাজার'-এর পাঁচ পাতায় দেখি মন্ত্রীর নির্দেশে আরও দু'সপ্তাহ বি, ই, বন্ধ থাকবে এবং স্ট্রাইকার ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ভাবলাম অবশ্যই ভুল। 'বর্তমান' পত্রিকায় দেখি প্রথম পাতায় খবর যে অভিভাবকরা মন্ত্রী মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। 'আজকাল'-এও সেই একই খবর। আলী মশাইকে স্মরণ করে আশ্বস্ত হলাম যে 'দেশ' আমার 'দেশ'ই আছে।

ইলিনয়ে পথে দেখা

অনেকক্ষণ ধরে গাড়ি চালাচ্ছি। কয়েকশ মাইল হবে। সেই মিনেসোটা (Minnesota) নর্থ ডাকোটার (North Dakota) বর্ডার-এর কাছ থেকে উইস্‌কন্‌সিন্ (Wisconsin) রাজ্য পার হয়ে শিকাগোর (Chicago) শহরতলীতে। রাতও হয়ে গেছে, কিন্তু ওর কোন মতেই ইচ্ছা নেই মোটেলে (Motel) উঠি। সে তার বন্ধু পর্ণার সঙ্গে দেখা করবেই। রাতের কয়েকটা ঘণ্টা হলেও চলবে। সে নাকি ক'দিন আগে হাজার মাইল দূর-এ আইডাহো (Idaho) না মনটানা (Montana) থেকে পর্ণাকে লং ডিসটেন্স ফোন করে বলে দিয়েছে যে, আমরা ওই পথে। ধূমকেতুর মত দেখা হলেও হতে পারে। কিন্তু সেই উইসকনসিন (wisconsin) ইলিনয় (illinois) বর্ডার পেরনো থেকেই প্রত্যেক রেস্ট এরিয়া (Rest Area) থেকে পর্ণাকে ফোন করে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ ধরছে না। তবুও পর্ণার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। পর্ণার কর্তাও খুব ভালো লোক, সে আমাদের কলেজের দাদা। কয়েকশ মাইল গাড়ি চালিয়ে দেহে ক্লান্তিও এসেছে। মনে হচ্ছে লাইট পোস্টগুলো যেন ৩০° বেঁকে গেছে। সামান্য বৃষ্টিও পড়ছে। এ হেন অবস্থায় ঠিক হল আমরা এক্সিজিট (Exit) নিয়ে বেরিয়ে সান্ধ্যভোজ সেরে শেষবারের মত চেষ্টা করে মোটেলে উঠব।

অত রাতে রেস্টুরেন্টে বেশী লোক নেই। ওদিকে মনে হল দুটি ভারতীয় ছেলে। মনে হল যে দুটি ছেলেরই দৃষ্টি আমাদের দিকে নিবদ্ধ। দূর থেকেই ইঙ্গিতে বললাম, "হায়"। কিছুপর দেখি ছেলেদুটি খাওয়া শেষ করে খাওয়ার কাগজপত্র ময়লাবাক্সে ফেলে হাতে ঠাণ্ডা পানীয়র গ্লাসটা ধরে এদিকে আসছে। আমরা আবার হেসে ভদ্রতা করলাম। লম্বাচুলের ছেলেটি বলল, "ইন্ডিয়ান?"

বললাম, "হ্যাঁ", এবং খালি চেয়ারটি দেখিয়ে বললাম, "এখানে বসুন না, আড্ডা দেওয়া যাবে?"

ছোটচুলের ছেলেটি বলল, "না বেশিক্ষণ বসা যাবে না। আমাদের তাড়া আছে। উই আর গোয়িং অন আওয়ার এ্যাপয়নমেন্টস।"

জিজ্ঞেস করলাম "কোথায়?" উত্তর দিল "ও বুঝবে না।"

"এখন, এই সময়?"

কথায় কথায় জানলাম অনু বা আনোয়ার, এবং আসু বা আসাদ দুজনেই পাকিস্তানের। কলেজে পড়ছে এবং কাজও করছে নিজের খরচা চালাবার জন্য। দুজনেই ২৫-২৬ বছর বয়সের হবে। তবে এখনও ভালমতো গুছিয়ে নিতে পারে নি। দেশের জন্য মন কেমন করে এখনও, এবং ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়। কথার মাঝে মাঝেই ও ফোন করতে যাচ্ছে দেখে অনু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল "দিদি কাকে ফোন করছে এত রাতে?" আমি আমাদের দ্বন্দ্বটা বুঝিয়ে বললাম, এবং এই সম্পূর্ণ অচেনা দুজনের কাছে আমাদের হাতের ব্যাগদুটো

রেখে ওদের কফি এনে দিলাম। এসে দেখি যেন দুজনেই খুব বিচলিত এবং দুজনেই নিজেদের মধ্যে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। বেশ সিরিয়াস কিছু মনে হল। একজন অন্যজনকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করছে "ঘরের অবস্থাটা কি রকম? ব্যাচিলার প্যাড্ (Bachelor Pad) এর মত নোংরা নয়ত?" আরও কি সব কথা। ফোনে চেষ্টা করে ও ফিরতেই আসু সরাসরি তাদের এ্যাপার্টমেন্ট-এর চাবিটা আমাদের সামনে রেখে উঠে দাঁড়াল। "আমরা ঠিক করেছি আজ রাতটা তোমরা আমাদের ওখানে থাকবে।"

"সে কি করে হয়? হঠাৎ দু মিনিটের আলাপে তোমরা আমাদের ঘর ছেড়ে দেবে? তাছাড়া তোমাদের ওই একঘরের এ্যাপার্টমেন্টে তোমরাই বা থাকবে কোথায়?"

"তোমার অত চিন্তার দরকার নেই। আসুর ব্যবস্থা অন্য জায়গায় হবে। আর আমায় রাতে ঘুমোতে হবে না," বলেই অনু চাবিটা আবার আমার দিকে এগিয়ে দিল। খড়্গপুরে যখন কলেজে পড়তাম তখন ট্রেনে আলাপ হয়েছিল নদীতে মাছ ধরেন পতিতপাবন বাবুর সঙ্গে। সেই অল্প আলাপেই মেছেদার কাছে তার গ্রামে আমাকে নিয়ে যাবেনই এবং হাত ধরে টানাটানির কথা মনে পড়ে গেল। উনি তখন মা কালীর দিব্যি দিয়েছিলেন ভালো মাছ খাওয়াবেন বলে। অনুও দেখি দিব্যি দিল যে রাতে কেউ কোন ঝামেলা তো করবেই না উপরন্তু ভোরে ব্রেকফাস্টে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

আমরা যখন কোন মতেই রাজী হচ্ছি না এত ভাল প্রপোজাল-এ তখন অগত্যা একটা ছোট চিরকুটে একটা ফোন নম্বর রেখে দিয়ে বলল, "যদি দরকার হয় তো রাতে এখানে ফোন কোর। সাহায্য পাবে।" দুহাত জোড় করে নমস্কার ও সালাম জানিয়ে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার কিছু পরে পর্ণাদের খোঁজ পাওয়া গেল, পার্টি থেকে ফিরেছে। ব্যাগগুলো গুছিয়ে তুলতে গিয়ে অনুর দেওয়া চিরকুটটা কোন মতেই পেলাম না।

রাস্তায় তখন বেশি গাড়ি নেই। পর্ণাদের বাড়ি তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য বিনা পয়সার রাস্তা ছেড়ে মাসুলওয়ালা টোল রাস্তাটা নিলাম। গোটা কয়েক টোলবুথ (Toll Booth) খোলা, সবগুলোতেই সবুজ বাতি। দোনামোনা করে একটাতে ঢুকে পড়লাম। টোল নেবার জন্য একটা হাত বেরিয়ে এসেছে। হাতটাকেও যেন চেনাচেনা মনে হচ্ছে। সেই অনুর হাতের মত ডান হাতের আঙুলে শাঁখার আংটি। আমি টাকা খোঁজার জন্য ব্যস্ত। শুনলাম কে যেন বলছে "বন্ধুদের সন্ধান পেয়েছ মন হচ্ছে। এই দেখ তোমাদের চিরকুটটা দিতে গিয়ে ওটা আমার হাতেই থেকে গেছে। আমি অত্যন্ত লজ্জিত।" বললাম "আমাদের ওদিকে এস কিন্তু।" তাড়াতাড়ি করে আমাদের ফোন নম্বরটা একটা চিরকুটে লিখছি, এই দুদণ্ডের দেরিতেই পেছনের গাড়িগুলো হর্ন বাজিয়ে গালাগালি দিতে আরম্ভ করেছে। কোনমতে দুজনে দুজনের চিরকুটটা হাতে গুজে দিলাম। আরও গালির ভয়ে আমিও তাড়াতাড়ি গাড়ির গতি তুললাম, তাছাড়া এই ঘটনা অনুর কাজের গাফিলতি বলে জানাজানি হলে ওরও ঝামেলা হতে পারে। চাকরীতে বদনাম হতে পারে। পর্ণার বাড়িতে চিরকুটটা খুলে দেখি সেটা আমারই লেখা অনুর জন্য।

ঘরে ফেরা

অজয় ও অমলার সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা অমিত আর শিখার বাড়ি সান্ধ্যভোজের আড্ডায়। মানে ডিনার পার্টিতে। প্রথমে ভাল চিনতে পারিনি, সেই অজয়ই কিনা তাই ভেবে। তার তো কলকাতাতে থাকার কথা! কলকাতায় ফেরার আগে অনেকবার ফোনে কথা হয়েছে। ওদের আমরা আন অফিসিয়াল এডভাইসার, ফোড়ে উপদেষ্টা, হয়ে গিয়েছিলাম কারণ আমরা ক'বছর আগে ছানাপোনা নিয়ে বেশ কিছুদিন "দেশ" এ ছিলাম। আমরা অবশ্য প্ল্যান করেই গিয়েছিলাম অল্প সময়ের জন্য, কিন্তু ওরা পাততাড়ি গুটিয়ে আমেরিকাকে বাই (বিদায়) জানিয়েই যাচ্ছিল তিন পুত্র সহ অনিল, অখিল, অদিত। ওরা আমাদের বন্ধুর বন্ধু। জিজ্ঞাসার মধ্যে প্রধানত ছিল ছেলেমেয়েদের স্কুল, এবং ওখানে মানানোর ব্যাপার। অমলার সঙ্গে শেফালীর কি কথা হত সেটা তারাই জানে— তবে অনেক কথা হত ঠিকই। অজয় অবশ্য, সুযোগ পেলেই আমার ছেলেমেয়েদের দেশের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করত। দেখা হওয়ার পর বললাম, 'কবে এলেন?' ভেবেছিলাম হয়ত বা বেড়াতে এসেছে।

"সে তো অনেকদিন হয়ে গেল। আবার তো ফেরৎ যাওয়ার সময় হয়ে এল। এক আইডিয়া নিয়ে গিয়েছিলাম, আর দেশে গিয়ে দেখলাম একেবারে টোটালি করাপ্ট, বাজে অবস্থা"। অজয় বলরামপুর নামে একটা ছোট্ট গ্রাম থেকে এসেছে। নিম্নবিত্ত পরিবারে মানুষ। তারপর কলকাতায় কাকার বাড়িতে পড়াশুনা। কাকার সাহায্যেই চার্টার্ড এ্যাকাউটেন্সি পড়েছে। তারপর এখন বছর কুড়ি আমেরিকায়, অমলা বীরভূমের মেয়ে। লেডী ব্রেবোর্নে পড়েছে। এখানে স্কুলে পড়ায়। অজয় একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর একাউনটেন্ট। দেশের টানে অনেকদিনের ইচ্ছা ওর কোম্পানী যে ডায়াবেটিক্সের ওষুধ বানায় তা দেশে বানাবে। মন্ত্রীমশাইরা যখন এদিকে এসেছেন ও তাদের সঙ্গে দেখা করছে নন-রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান (এন, আর, আই) হিসেবে কি ভাবে পশ্চিমবাংলায় ইনভেস্ট, বিনিয়োগ, করা যায় জানতে। দেশে আজকাল নাকি সবাই ডায়াবেটিস-এ ভুগছে। অমলার স্বপ্ন আমেরিকায় যে ভাবে প্রতিবন্ধী, হ্যানডিক্যাপট্‌দের আর পাঁচজনের মত লেখাপড়া-খেলাধূলা শেখানো হয়, সেই ধরনের একটা ইস্কুল করা—প্রথমে ওদের বাড়িতেই সেই ইস্কুলে হবে।

বাবা, কাকা সবাই ভাড়া বাড়িতে থাকায় অজয়-অমলার প্রথম কাজ হয়েছিল একটা মাথা গোঁজার জায়গা। দুজনে মাথার রক্ত জল করে তাদের সঞ্চয় দিয়ে দমদমের ওদিকে একটা ছোট বাড়ি তৈরি করে। একতলার একদিকে কাকার পরিবার—দুই ছেলের পরিবার সহ, অন্যদিকে মা বাবা ও ভাই অঞ্জনের পরিবার। ক'বছর পরে দোতলা তুলেছে—এসে থাকবে বলে। খালিই পড়ে থাকত লোকজন এলে ওদের ঘরগুলো ব্যবহার হত।

"কেউ বলেনি আপনাকে? আমাদের আর কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করার মানসিকতা ছিল না। সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম আর অপেক্ষা করলে বাচ্চাগুলোর জীবনও ধ্বংস হবে। শুধু যে নিঃস্ব হয়েছি তা "নয়, সঙ্গে এনেছি এক বিরাট দেনা।"

মহিলা তার স্বামীকে ধাতানি দিয়ে থামিয়ে দিয়ে নিজেই শুরু করলেন। "আপনাদের মতই আমরাও সব রকম স্কুলে ছেলেমেয়েদের জন্য লিখি, এখান থেকেই। বাংলা, ইংরাজী, এমনকি হিন্দী মিডিয়াম। সরকারী, প্রাইভেট, ক্যাথলিক, সেকুলার সব খানেই দরখাস্ত করেছিলাম। ১৫ টাকা মাইনে থেকে মাসে দেড় হাজার টাকা মাইনের। বয়েজ, গার্লস, কো-এডুকেশনাল। স্কুল বাসওয়ালা আর ইস্কুল বাস ছাড়া সবরকমই। আপনার মতই আমাকেও ওই মডার্ণ গার্লস ছাড়া কেউই উত্তরটাও দেয়নি। ইন্টারন্যাশনাল স্কুল দিয়েছিল কিনা মনে নেই। ও আর আমি যে স্কুলে পড়েছি তাদের এক্স-স্টুডেন্ট বলে লিখলাম, তাতেও কেউ উত্তর দিল না। দেশে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে তারা সরাসরি বা ইনিয়েবিনিয়ে ঘুষ চাইল। আবার বলে কি তাদের পার্টিকে টাকা দিতে হবে। এটা কল্পনার বাইরে। একজন আবার রাইটার্সে গিয়ে ঘুষ দিতে বলল। আগে যখন আমরা দুজনে পার্টি করতাম তখন ওই প্রাইভেট স্কুলে বিল্ডিং ফান্ড বলে টাকা নিলে আমরা যা তা বলতাম। এ তো তার থেকে হাজার গুণ 'খারাপ'।

"এখন এক্সটরশন রাজ তৈরি হয়েছে। আমরা যে কত নিচে নেমেছি প্রথম ক'দিনের ধাক্কায় বুঝেছি," মনে হল উনি হয়ত কেঁদেই ফেলবেন।

অজয় আবার শুরু করল, "ও তো কিছুই না, আমি আমার নিজের রক্তে তৈরি বাড়িতে পা দিতে পারলাম না। এর থেকে আর কি খারাপ হতে পারে? মা-বাবার আপত্তি সত্ত্বেও আমি আমার এক পুরনো চেনা বন্ধুর অনুরোধে একটা অফিসকে ভাড়া দিয়েছিলাম। কথা ছিল আমি আসার ১০-১২ মাস আগে থেকে জানালে তারা উঠে যাবে। কিরণ আমার পুরনো বন্ধু, এক সঙ্গে কলেজে পড়েছি, পার্টিও করেছি এক সঙ্গে। সেই কিরণ এখন রাজনীতিতে বড় চাঁই। কাজটাজ কিছু করে না। সেই আমাকে বলে "তুই আমাকে একলাখ, ফান্ড-এ আরেকলাখ দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে..."। ওর কথার মাঝেই উত্তেজিত হয়ে তপনবাবু শুরু করলেন, "আপনি তো প্রাণে বেঁচেছেন। আমরা গিয়ে থাকব বলে আমাদের তিনতলায় ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিতে রিকোয়েস্ট করার অপরাধে আমার বোনের বাড়িতে ঠ্যাঙাড়ে লোকেরা আগুন নিয়ে ধাওয়া করে। পুলিশ কোন রিপোর্টও নেবে না। ভাবতে পারবেন না সেই ফ্ল্যাটে থাকে আমাদের এক পার্টির খুব নামকরা এক লোকের রক্ষিতা। সে প্রায়ই রাত কাটাতে আসেন, তবে সবারই মুখ চুপ"।

ফেলে আসা দেশ সম্পর্কে কারই বা খারাপ কথা শুনতে ভাল লাগে। মাধুরীদি, কমলদা, চণ্ডী মাঝে মধ্যে "কিন্তু", "হয়ত বা" এইরকম কিছু বলে একটু আধটু আপত্তি জানাল। অন্যদিকে আসফ, তরুণদা আর কে কে যেন তপনবাবুকে সায় জানিয়ে যাচ্ছিল।

"থাকতে যখন হবেই তখন কাগজেও এ্যাড দিলাম সল্টলেকের জমির জন্য। অনেক প্রোপোজাল পেলাম। সবাই নব্বইভাগ কালো টাকা চায়। বড়শালার থ্রু দিয়ে গেলাম পার্টির লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। মন চাইছিল না কারণ এ তো সম্পূর্ণ এ্যানটি-ডেমোক্র্যাটিক সেট আপ। যার জন্য খেটেছি এতো তার বিপরীত। কিন্তু তখন আমি ডেসপারেট। তারাও যে কি

করাপ্ট তা আমাদের আমলে এ কেউ ভাবতে পারত না। আপনি বিশ্বাস করবেন না শেষে কার কাছ থেকে অফার পেলাম। একদিন বেশ সকালে এক অচেনা ভদ্রলোক এসে হাজির। বললেন, "আপনাকে সেকেন্ড হ্যান্ড টাইটেল নিতে হবে না। আমি ক্লিয়ার টাইটেলওয়ালা প্লট আপনাকে দেব"। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সেটা কি করে সম্ভব?" ভদ্রলোক বললেন, "সে চিন্তা আমার।" কিছু কাগজও দেখালেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর বলেই ফেললেন, অমুকবাবুর নাম। খুব নাম করা মন্ত্রী। জানালেন যে মন্ত্রীমশাইয়ের নামে বেশ কিছু প্লট আছে তার থেকে একটা দেবেন, কিন্তু কয়েক লাখ টাকা তার নামে দিতে হবে, বাদবাকিটা ফান্ডের নামে। ভাবতে পারেন?

"এ শালার মাথা খারাপ।...কমলদার কথা শেষ হবার আগেই অজয়, অমলা চ্যালেঞ্জ জানালে "কত রেট? একশ? এক হাজার? কিছু প্রুফ খুঁজলে পাওয়া যাবে, রাজী?"

নিজের ফ্ল্যাটে, বাচ্চাদের ইস্কুল, যাতায়াতের ঠেলাঠেলি সল্টলেকে প্লট খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওষুধের ফ্যাক্টরির জন্য জায়গা খোঁজা ওরা চালিয়ে যাচ্ছিল। অনেকদিনের স্বপ্ন, বহু বছর গায়ের রক্ত জল করে দুজনেই দিনে দশ, বার, এমনকি ষোল ঘণ্টা কাজ করেছে। এ তো আর দেশের কাজ নয় যে পুরোটাই ফাঁকি। অমলা এক সময় এক জায়গায় কাজ করছে সেখানে তিন মাসে পাঁচবারের বেশি দেরিতে গেলে কাজ চলে যেত। সে মাইনাস ১০° ফা. ঠাণ্ডাই হোক বা আট ইঞ্চি বরফ পড়ে রাস্তায় গাড়ির ঝামেলা হলেও। সঙ্গে সঙ্গে পুত্র-কন্যাদের বোঝার বয়স হতে হতেই বাম-মা ব্রেন ওয়াস, মগজ ধোলাই, চালাত "দেশ" সম্পর্কে। এদেশে বাচ্চারা অনেক ছোট বয়স থেকেই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে, কাজে ও কথায় ইস্কুল, সমাজ, পরিবার সবাই তাই শেখায়। সত্যি কথা বলতে এতটুকু কুণ্ঠা নেই তাদের, অপ্রিয় হলেও। কবে যেন মেজপুত্র অখিল বলেই ফেলেছিল "ওটা তো তোমাদের দেশ, এটা আমাদের দেশ"। এরপর থেকে বাচ্চারা এই ধুয়া ধরত মাঝে মধ্যে। ওরা এরপর বলতে শুরু করেছিল যে "ওটা তোমাদের এ্যানসেস্ট্রাল হোমল্যান্ড, পূর্বপুরুষের দেশ"। ওই ব্যাখ্যাতে চলছিল ভালই শেষবার দেশে ঘুরে আসার পর থেকেই বড় ছেলে অনিল বলতে আরম্ভ করেছিল "বাবা আমার এ্যানসেস্ট্রাল হোমল্যান্ড বাংলাদেশ সেখানে যাও না কেন?" অজয় বাঙাল হলেও অমলা ঘটি। এরপর আবার যুক্তিটা পাল্টায় মা-বাবা। এবার অজয়রা শুধু বলত ওটা দাদু, দিদিমা, ঠাকুমা, কাকা, পিসী, কাকা-দাদুর দেশ। এটা মোক্ষম যুক্তি। বাচ্চাদের সবারই দেশের পরিবারের গণ্ডীটা সবটাই ভাল লাগত।

কিন্তু গণ্ডীটার বাইরে রাস্তায় বেরলে, কিছু কিছু খারাপ লাগত, সে পরিবারের শত মগজ ধোলাই সত্ত্বেও। আর দেশের প্রজন্ম তো, তাই খারাপটা কেউই রেখে ঢেকে বলত না। আর অভ্যাস তাদের নেই। বড়দের বুকে যেন সত্যি কথাগুলো তীর হয়ে বিঁধতো।

ওদিকে ইন্‌ডাসট্রিয়াল প্লট যোগাড় করতে অজয়ের অন্য এক অভিজ্ঞতা। অত লেখালেখি, দেখাদেখি, আমেরিকা থেকে লং ডিসটেন্স টেলিফোন কল, আসার পর সবই যেন অর্থহীন। এ বলে তার সঙ্গে দেখা কর, সে বলে ওর সঙ্গে। মন্ত্রী বলে আমলার সঙ্গে কথা বলুন", আমলা বলে, "কেরানীর কথাই ঠিক," কেরানী বলে, "পার্টির পাণ্ডা কি বলেছে?" এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। কোথায় কল্যাণী, কোথায় ইস্‌টার্ন বাইপাস, আর কোথায় বা হাওড়া, সল্টলেকের জমি। বুঝতে বেশিদিন লাগেনি ফর্মূলাটা। সবটাই হচ্ছে দু নম্বরি ব্যাপার। একজন ভদ্রলোক সরাসরিই বলে

ফেললেন, "কথা যে বলব তা আজ আপনি কত এনেছেন সঙ্গে করে?"

"মানে?"

'আমার কমিশনটা এনেছেন? আর বড়বাবুদের রেটটা এইরকম। নিচের লোকে কত নেবে তারাই বলে দেবে।"

রেগে বলেছিল, "এ কি মগের মুল্লুক পেয়েছেন?"

আরে বসুন বসুন, চেঁচামেচি করে লাভ হবে না। এটাই নিয়ম। আপনাদের অনেক টাকা, ফোন করলেই ডলার চলে আসে।"

"এ কখনও হতে পারে না। আপনি কি বলছেন? পুরনো আমলে এই ছিল?"

যতই ঘুরেছে, যতই কথা বলেছে ও ততই মর্মাহত হয়েছে। কাজ এতটুকুও এগোয়নি। আগে লোকে ঠাট্টা করে বলত যে কলকাতা করপোরেশনের দেওয়ালও নাকি ঘুষ নেয়। দেওয়ালের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়ালে দেওয়ালও নাকি হাত বাড়ায়। কিন্তু এখন? যারাই রক্ষক তারাই ভক্ষক। অনেক সহৃদয়, নীতিবান লোকের খোঁজও ওরা পেয়েছে। তাদেরই ভরসায় অতদিন থাকতে পেরেছিল, কিন্তু এরা সবাই অপাংক্তেয়, ও সবাই অরাজনৈতিক।

"জানেন দেশে থেকে মনে হয়েছে যে সম্পূর্ণ একটা কর্মবিমুখ, কাজবিরোধী, গতরখাটা বিরোধী, পরগাছা কালচার তৈরি হয়েছে। এটা আমাদের সময় ছিল না। যতই দিন যাচ্ছে ততই বাঙালীদের "ছোট কাজ" বিরোধী মানসিকতা বেড়েছে। যেখানেই গেছি কেউ কাজ করেনি। সবাই টাকা চেয়েছে। শেষে রেগেমেগে একজন কর্তাবাবুকে বলেই ফেললাম যে আপনারা একটা শ্রম-বিরোধী পরগাছা সোসাইটি তৈরি করছেন। কিন্তু পরগাছার কতদিন জীবন? কর্তাবাবুর শাকরেদরা আমাকে "দূর দূর" করে তাড়িয়ে দিয়েছিল।"

সরকারের মাঝারি আমলা অনিতাদেবী বলেছিলেন, "জানেন আমি যে অফিসে কাজ করতাম, সবাই ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র-ছাত্রী। প্রথম যখন ঢুকি তখন কিছু কাজ হোত। এখন সম্পূর্ণ কাজ-বিহীন। মন্ত্রীমশাইদের কাছে আবেদন করেও কিছু হয়নি। এখন শুধু একটাই আন্দোলন মাইনে বাড়ানোর। আমরা নিজেরাই বলি আমরা একেবারে প্যারাসাইট, পরগাছা হয়ে গেছি। যে দেশে গড় আয় বছরে তিন হাজার টাকা, সেখানে যাদের আয় মাসে তিন হাজার টাকা তারাই মাইনে বাড়ানোর জন্য আন্দোলন করছে। সরকার বলছে বড়লোকরা ট্যাক্স দেয় না। তাহলে টাকা আসছে হয় গরীবদের এক্সপ্লয়েট করে অথবা বিদেশে যে গরীব দিনে বারোঘণ্টা খেটে কর (ট্যাক্স) দিচ্ছে তার করের টাকার ফরেন এইড-এ, আর নাহলে আপনাদের টাকায়"। অনেকেই মাথা হয়ত নেড়ে আপত্তি জানিয়েছিল।

কেউ বলেছিল, "পরের ধনে পোদ্দারী" কিন্তু অজয়-এর ধন?

অজয়, অমলা অবশেষে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে। ছেলেমেয়েদের অনেকদূরের স্কুলে ঢোকায়। কিন্তু অমলার নতুন ধরনের স্কুল? সেটা তখনও জবর-দখল। গুণ্ডা-বন্ধুর হাতে। আর চেঁচামেচি করলে ওর পরিবারকেই বাড়িছাড়া করবে বলে শমন এসেছে!

আর আজয়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লট লাখ লাখ ঘুষের পরও হাতে আসেনি। নিজেদের সঞ্চয় কমেছে ও আমেরিকান ব্যাংক লোন-এর ভার বেড়েছে, "এমন অবস্থায় কতদিন শ্রম-হীন, কর্ম-হীন, পরগাছার মত থাকা যায়?" অমলা জিজ্ঞেস করে।

আমেরিকায় স্বাধিকার অর্জনে প্রথম পদক্ষেপ : নির্বাচনে অংশ গ্রহণ

১৯৬৫ তে আমেরিকায় ইমিগ্রেশন রিফর্ম বিল পাশ হওয়ার পরেই একজন দুজন করে ভারতীয় ও বাঙালী এদেশে আসতে আরম্ভ করে এবং আজ প্রায় এক মিলিয়ন বা দশ লক্ষ দঃ এশীয় এদেশে আছে। (এই সংখ্যায় অবশ্যই বেশ কিছু ভারতীয় বংশদ্ভুত আছেন যারা জন্মেছে আফ্রিকা, ইংলণ্ড, গায়ানা, ত্রিনিদাদ-সহ আমেরিকাতে। এছাড়া আমেরিকার প্রায়শঃই সব দক্ষিণ এশিয়াবাসীদের ইন্ডিয়ান বা হিন্দু বলে অনেকে ডাকে এবং এই সংখ্যায় বাংলাদেশী পাকিস্তানী, শ্রীলংকান আছেন।)

আমেরিকায় ভারতীয় সমাজের একটা বিরাট অংশ শিক্ষিত, বিত্তবান, অর্থবান। গরীবও অনেক আছে এবং তার সংখ্যা বোধ হয় বাড়ছে। দক্ষিণ এশিয়া সমাজের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সাধারণতঃ সীমিত থাকে সেখানকার কেন্দ্রীয় ফেডারাল সরকারের সেনেটর, কংগ্রেসম্যান বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তহবিল সংগ্রহে (ফান্ড রেইজিং) অর্থ সাহায্য করার মাধ্যমে। এছাড়া কয়েকজন অত্যন্ত সাহসী কয়েকটা উঁচু পদের নির্বাচনে প্রার্থীও হয়েছেন। তবে খুবই সামান্য কয়েকজন নীচের বা গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূলের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন।

১৯৯৬-এর নিউইয়র্ক শহরের স্কুল বোর্ডের নির্বাচনে এই প্রথম ভারতীয়, দক্ষিণ এশিয়া লোকেরা নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে যোগদান করে। তার মধ্যে আমি একজন ছিলাম। আমেরিকায় স্কুল বোর্ড নির্বাচনকে ধরা হয় জনগণের সবচেয়ে কাছের এবং তৃণমূলের নির্বাচন। সেদেশে স্কুল বোর্ড সবকিছু পাঠ্যসূচী, শিক্ষক-শিক্ষিকা-প্রিন্সিপাল-অধিকর্তা (সুপারিনটেনডেন্ট), রাধুনী, কাস্টোডিয়ান (জমাদার) ক্রসিং গার্ড (রাস্তাপারাপারের পুলিস) নিয়োগ, সকালের জলখাবার ও দুপুরের খাওয়া (লান্চ), বইপত্র কাগজপত্র-কম্প্যুটার কেনা ও সারানো, ইসকুল বাড়ী তৈরি ও সারানো, ট্যাক্স (কর) বসিয়ে স্কুল চালানোর খরচা, ইত্যাদি ঠিক করে। স্কুল বোর্ডের আওতা থেকে বাদ থাকে বেসরকারী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-চালিত স্কুল যার সংখ্যা খুব বেশী নয়।

নিউইয়র্ক শহরের স্কুল বোর্ড আমেরিকার সবচেয়ে বড় এবং খুব বড় হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় সেন্ট্রাল বোর্ডের হাতে হাইস্কুল (গ্রেড ৯, ১০, ১১ এবং ১২) রেখে জেলা বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের হাতে প্রাথমিক স্কুল (কিন্ডারগার্টেন থেকে গ্রেড ৫) এবং মিডিল বা মাধ্যমিক স্কুল (গ্রেড ৬, ৭, ৮ এবং কিছু স্কুলে ৯) রাখা হয়। প্রত্যেকটা ডিসট্রিক্ট ১৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ ছাত্র-ছাত্রীর ভার পায়, এবং বাৎসরিক ১০০ মিলিয়ন ডলার (৪৫০ কোটি টাকা) থেকে ১৫০ মিলিয়ন ডলার (৭০০ কোটি টাকা) খরচ করে।

এবারের নির্বাচনে প্রাথমিক ভাবে চারজন ইন্ডিয়ান চারটে জেলা থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। (সেদেশের নির্বাচনী আইন অনুযায়ী সব নির্বাচনেই প্রার্থীদের অবশ্যই পাকাপাকিভাবে

বাস করা এলাকা থেকেই প্রার্থী হতে হয়।) দক্ষিণ আমেরিকার রামেশ্বর যোধার নির্বাচনী দরখাস্তে ভুল থাকায় প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পরে যান। বাকী তিনজনের একজন গুজরাতে জন্ম, মোরশেদ্ আলম্ এর জন্ম কুমিল্লায় এবং আমি। মোরশেদ ও আমার নির্বাচনী এলাকা পাশাপাশি হওয়া ছাড়াও আমরা প্রায় একই সংগে দুজনের নির্বাচনী প্রচার চালাই। আমাদের অনেকের অভিজ্ঞতা নিয়েই এটা লিখছি।

আমার এলাকা ডিসট্রিক্ট ২৬, নিউইয়র্ক শহরের কুইন্স কাউন্টিতে অবস্থিত এবং শহরের সবচেয়ে সেরা ডিসট্রিক্ট, এবং রাজ্যের মধ্যে অন্যতম। এখন সেখানে আমাদের পাড়া সহ কয়েকটা এলাকায় বেশ কিছু দঃ এশীয় অধিবাসী এসেছেন, যার অধিকাংশই হচ্ছেন কেরালার খৃষ্টান এবং গুজরাতী হিন্দু। এছাড়া এলাকায় আরও আছেন চীন, তাইওয়ান, হংকং-এর চীনা, কোরীয়, দক্ষিণ আমেরিকার স্প্যানীয়, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের হাজার হাজার অধিবাসী। আমি ছাড়াও আমাদের ডিসট্রিক্ট-এ এশিয়ায় জন্ম একজন চীনা ভদ্রলোক এবং কোরিয়ান মহিলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জেতেন। আমাদের বোর্ডে নয়টা পদের জন্য ১৪ জন প্রার্থী। আমাদের ডিসট্রিক্ট-এ ভোটার এর সংখ্যা ছিল এক লক্ষের বেশ কিছু বেশী (আড়াই লক্ষের বসবাস)। তার মধ্যে ভারতীয় ভোটার ৬০০-৭০০-এর মত এবং দুই বাংলার বাঙালী মিলিয়ে ৪০-৫০ জনের বেশী বাঙালী ভোটার নয়।

এই নির্বাচনে সবচেয়ে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা ছিল আমার নিজের বন্ধুদের প্রাণঢালা সাহায্য এবং অপরিচিত অভারতীয়দের অকপট সমর্থন। আমার স্ত্রী ও অল্পবয়সী পুত্র-কন্যা, বি.ই. কলেজ ও আই. আই. টি. খড়গপুরের প্রাক্তন এবং আমেরিকার ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভারসিটির প্রাক্তনী এবং বেশ কয়েকজন গুজরাতী এবং বাংলাদেশী বিশেষতঃ কয়েকজন বাংলাদেশী হিন্দু ও বৌদ্ধ, যেভাবে খেটেছেন সেটা না বললে অন্যায় হবে। আমি মনে করি যে বিদেশে "হোয়াট গুজরাটিস ডু টু ডে, রেস্ট অব ইন্ডিয়ানস্ উইল ডু ইট টুমরো" (যা গুজরাটিরা আজ করে, অন্য ভারতীয়রা তা আগামীকাল করবে।) আমার নির্বাচনী কাজে সাহায্য করার জন্য নির্দ্ধিধায় এগিয়ে আসেন গুজরাতী গৃহবধূ থেকে দাদু থেকে ব্যবসায়ীনী ও স্থপতি। আমার নিকট বন্ধু ছাড়া আমেরিকায় ভারত উপমহাদেশের নেতারা কোন উৎসাহই দেখায় নি। একজন পূর্বতন বাম নেতা যা বললেন তার অর্থ এই হয় যে "আমরা শুধু সাদাদেরই সাহায্য করি। অন্যদিকে বাংলাদেশী নির্বাচনের আগে, তহবিল সংগ্রহ (৬৫% তহবিল তাদের থেকেই আসে), ও নির্বাচনের পরে অভিনন্দনেরও আয়োজন করেন।

অনেক ভারতীয় ভোট দিতেও ভয় পায়। এছাড়া অনেকে যুগ যুগ ধরে সেখানে থেকেও নিজেকে পরবাসী হয়েই ভাবতে ভালবাসেন, এবং আমেরিকার সমাজের কিছু জানতেও চান না। আরও অনেকে সেখানে নিজেকে মার্জিনাল বা অপাংক্তেও হয়ে থাকতেই ভালোবাসেন। নিউইয়র্কের নির্বাচনে যেহেতু এই প্রথম ভারতীয় দক্ষিণ এশিয়ার লোকেরা যোগ দিয়েছে তাই সেখানকার সমস্ত নামকরা পত্রিকা আমাদের অবস্থানকে তুলে ধরে। দু-একটা ভারতীয় ও বাংলাদেশী সাপ্তাহিকও আমাদের কথা লেখে। তবে অধিকাংশই সে দেশে আমাদের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে লেখালেখি করে না, করে উপমহাদেশের খবর, কেচ্ছা, সিনেমা নিয়ে। স্কুল বোর্ড নির্বাচনে প্রায়

সব অধিবাসী জাতিগত সংগঠন, বিভিন্ন মতামতের দল, ইউনিয়ন নিজেদেরকে সংগঠিত করে তাদের প্রার্থীদের জয়ী করার চেষ্টা করে। চীনা, কোরিয়ান, স্প্যানীয়, বাংলাদেশী, শিক্ষক, কর্মচারী ইউনিয়ন, ইহুদী, খৃষ্টান, ইসলামী ও আরও অনেক সংগঠন নিজেদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করে। ব্যতিক্রম ভারতীয়, দক্ষিণ এশিয়দের। আমার নির্বাচিত হওয়ার পেছনে আছে শিক্ষক ইউনিয়ন, কর্মচারী-ইউনিয়ন; ইহুদী সংগঠন-এর সমর্থন ও অনেক স্কুলের অভিভাবকদের সংগঠনের সমর্থন এবং নির্বাচনের দিনে আটজন ভারতীয় মহিলার নিঃস্বার্থ খাটুনি। আমার ভোটের প্রায় ১৮% আসে কোরিয়ানদের কাছ থেকে, প্রায় ৫০% আসে খৃষ্টান, ইহুদী ও স্প্যানীয় ভাষীদের থেকে। ডিসট্রিক্ট ২৯ থেকে মোরশেদ আলম ও নির্বাচিত হন। মোটের ওপর একটা বড় কোয়ালিশন আমাকে নির্বাচিত করতে সাহায্য করে। নিউইয়র্কের যে কোনো পদে এই প্রথম ইন্ডিয়ান বা বাঙালী হিসেবে আমি তাদেরকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম।

পারাপার

আগে আমাদের বাংলাদেশ-এ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বা দেশ থেকে দেশান্তরে যেতে গেলে খেয়া বা জলযানই প্রধান উপায় ছিলো। অনেক ক্ষেত্রে তাই একমাত্র উপায় ছিলো গরুর গাড়িতে কিছুদূর গিয়ে খাল-বিল-নদী-নালার পাড়ে এসে নৌকার ভরসায় দাঁড়াতে হতো। সড়ক ও সেতু তো অল্পদিনের কথা। রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছুদিন আগেই লিখে গেছেন ঃ

'ওগো, তোরা কে যাবি পারে।
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে।'

আজকালতো জেট এর যুগ। তাই খেয়া পারাপারের বদলে দেশ থেকে দেশ-এ যেতে গেলে ওই জেটে (উড়োজাহাজেই) উঠতে হয়। কাকা, দাদু, এদের কাছে শুনেছি যে তারা বঙ্গদেশে কোলকাতা থেকে ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চাঁদপুর, গোয়ালন্দ, চট্টগ্রাম, রেংগুন যাতায়াত করতেন ওই স্টিমার ও লঞ্চ নামক খেয়ার মাধ্যমে। আমাদের দেশে স্বাধীনতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'সূর্য পাটে—নেমে যাওয়ার দরুণ সুবাতাস (গেছে) থেমে' তাই ওই যোগাযোগ পথগুলো বন্ধ অনেকদিন। কিন্তু ইউরোপে জেট এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখনও খেয়া পারাপার ভালোভাবেই বেঁচে আছে। এর মধ্যে যেগুলো চড়ে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি তার মধ্যে আছে ঃ ইংল্যান্ড-ফ্রান্স, স্কটল্যান্ড-উত্তর আয়ারল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড-ওয়েলস, জার্মানী-ডেনমার্ক, ডেনমার্ক-সুইডেন, নরওয়ে-ডেনমার্ক। এগুলো যতোবারই চড়েছি ততোবারই আমাকে জল-প্রধান বাংলার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। এককালে কোলকাতা থেকেও জলপথে কাশী, এলাহাবাদ থেকে পুরী মাদ্রাজও যাওয়া যেতো—সেও তো অনেকদিন বন্ধ।

জীবনে আমার প্রথম দেশ পারাপার-এর অভিজ্ঞতা ওই জেট খেয়ার দৌলতে। এর পরে স্থলপথে অনেকবার পার হয়েছি দেশের সীমানা, তার অধিকাংশই হচ্ছে, আমেরিকা-কানাডা। এই পারাপার করেছি অগুনতিবার, এবং সবসময়ই গাড়ি করে। একবারতো গেলাম উত্তর নিউইয়র্ক থেকে কানাডার ক্যুইবেক প্রদেশে মাত্র কয়েকঘণ্টার জন্য শুধু রাতের সান্ধ্যভোজ (ডিনার) এর জন্য। (এই রকম একবার নেদারল্যান্ড থেকে বেলজিয়াম এ গিয়েছিলাম সান্ধ্যভোজের জন্য)। এছাড়া স্থলপথে পারাপার করেছি আমেরিকা-মেকসিকো, ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ। আমাদের দেশে প্রথম পার হই সত্তরের দশকে। এর আগে ষাটের দশকে কোলকাতার কাছে বেনাপোলে গিয়েছিলাম আমার বন্ধু পীযুষের সঙ্গে। ও আমাদের কলেজে এসেছিলো হঠাৎ ছিটকে, একেবারে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বর্ষে, পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) থেকে। ও ছাড়া আরও ক'জন ছিলো; শেষাদ্রী, সৌমিত্রি, অঞ্জন, প্রশান্ত, শিবপ্রসাদ, আরও কে কে যেন। ১৯৬৪-তে কাশ্মীরের শ্রীনগরে ভগবান মুহাম্মদ এর পবিত্র চুল 'হজরত বাল মসজিদ' থেকে হারিয়ে গেছে গুজবে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান

ও প্রাদেশিক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্ররোচনায় পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু বিরোধী অভিযান হয়। এর ফলে হাজার দশেক অমুসলিম প্রাণ হারান, এবং বারো লক্ষের বেশী হিন্দু-বৌদ্ধ-আদিবাসী উদ্বাস্তু ভারতে আশ্রয় নেন। (দেখুন 'ইত্তেফাক', ১.১৫.৬৪ইং 'লন্ডন টাইমস' ১.২৩.৯৬ইং, ওয়াশিংটন পোষ্ট ১.২২.৬৪, ইদানীংকালে 'ভোরের কাগজ' নভেঃ ৮.৯০. উদ্বাস্তুর জন্য মারকাস ফ্রান্ডা, 'পপুলেশন পলিটিক্স ইন সাউদ এশিয়া' আমেরিকান ইউনিভারসিটি ১৯৭২)। এ'টা সরকারী আশ্রয়প্রার্থীর হিসাব। এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনেকেই ডাক্তারী, ইনজিনিয়ারিং, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ছিলো—পীযুষ ও অন্যান্যরা ওই দলেরই। প্রোগ্রামের প্রথম দিনেই পীযূষের গাড়ি আক্রান্ত হয়। ওর বাবা নামকরা ডাক্তার ছিলেন। কথা ছিলো গাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাটের সঙ্গে সঙ্গে পীযুষের বাবা ডাক্তার গৌরীশংকরকে উচিত শিক্ষা দেবে। এবং পিতাপুত্রকে জেলবাস করাবে। পীযুষ পুকুরে শাপলার মধ্যে গা ঢাকা দিলো। ওর মা-বাবাকে বেদম প্রহারের পর বাবাকে পুলিশে নিয়ে যায়। ওর মা বাধা দিলে তাকে আবারও শাস্তি পেতে হয় প্রতিবেশীর হাতে। এরপর পীযুষ আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে হাজির হয় আসামে। সেখানে বেশ কিছুদিন ক্যাম্পে থাকার পর আসে পশ্চিমবাংলার ক্যাম্পে। সেখান থেকে এই দরবার, ওই দরবার করতে করতে আমাদের কলেজে ওর আগের কলেজের পড়ার সাখ্য (সারটিফিকেট) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান পূর্ব পাকিস্তানের এক আমেরিকান অধ্যাপক। ওদিকে অত্যাচারে পীযুষের মা অসুস্থ হয়ে পড়লে ওনাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন ওর মামা। এবং কয়েকমাস পরে একটু সুস্থ হলে ওর বাবার ইচ্ছায় পাসপোর্ট ভিসা জোরে কোলকাতায় আসেন চিকিৎসার জন্য। আসার পরে ১৯৬৫-তে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, এবং ওর মা অদিতিদেবীও তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অদিতিদেবী তার ভাই জয়দেব এর কাছে পোস্টকার্ড মারফত জানেন যে স্বামী স্ত্রীর সাময়িক দূরত্ব আর কমানো যাবে না। যোগাযোগ একটু ভালো হলেই অদিতিদেবী ছুটে যাচ্ছিলেন 'শেষ সময়ে মুখে জল না দেওয়ার' দুঃখ ঘোচাতে। এসেও ছিলেন শাঁখা-সিন্দুর মুছে তখন গৌরীবাবুর উপদেশে। ফিরেও যাচ্ছেন শাঁখা-সিন্দুর মুছে। এবারে পীযুষ বলেছিলো, 'একটু সাবধানে থেকো'। উত্তরে বলেছিলেন, 'কিসের ভয়'? এবারে উনি একাই যাচ্ছিলেন, ওপারে এসেছিলেন ওর মামা। মামা গ্রামে সবসময়ই ধুতি পরতেন, কিন্তু 'গন্ডগোলের' সময় অনেক ধুতিওয়ালা খুন হয়েছিলো বলে এসেছিলেন সাদা পাজামা ও পানজাবী পরে। সেবারে চেক পোস্টে সবাই মাছি মারছিলো। আমরা যতোক্ষণ ছিলাম পীযুষের মাই একমাত্র পারাপারের যাত্রী ছিলেন। প্রথমে দূর থেকে আমরা হাতনেড়ে জানিয়ে ছিলাম যে 'আমরা এসেছি।' তারপর দুদিকের দারোয়ানদের থেকে অনুমতি ও সহানুভূতি নিয়ে এক পা এক পা করে দুই দেশকে ভাগাভাগি করেছে যে সাদা দাগ, সেই পর্যন্ত। দাগের ওপারে লাহোর থাম দিয়ে রাস্তা আটকানো যাতে গাড়ি না যেতে পারে। আমরা এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম জানালাম। আইনের চোখে পীযুষের মা হয়ে গেলেন বিদেশী। পীযুষ দেশী হতে চাইলেও দেশ আর তাকে কিছুতেই দেশী হতে দেবেনা। অনেক কাঠখড় পোড়ালেও পীযুষ আর তার দেশী পাসপোর্ট পেলো না। অদিতিদেবী কেঁদে কেঁদে ছেলেকে সান্ত্বনা দিতে দিতে এক পা এক পা করে

এগিয়ে গেলেন। ঝাপসা চোখে পীযুষও মাসিমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে ওই সাদা দাগের এপার থেকে, সেই লাহোর থামের এদিক থেকে, সেই দেশী মায়ের বিদেশী ছেলে। মাসিমার সাদা থান ও মামার সাদা প্যজামা ও সাদা পানজাবীও আমাদের কাছে আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে গেলো। এরপর দেশে পারাপার করেছি অনেকবার, তবে বেশীই পবনদেবেন বাহনে চড়ে। প্রথমবার যখন স্থলপথে আসি সেবার যশোর থেকে বেনাপোলে সঙ্গী পেয়েছিলাম উত্তর কোলকাতার বনেদী পরিবারের মক্‌বুল আহসানকে। মক্‌বুলবাবু তার মেয়ে আফরোজাকে বিয়ে দিয়েছিলেন ঢাকার সুপাত্র তারেক এর সঙ্গে। এবার ঢাকা গিয়েছিলেন তারেক ও আফরোজাকে পাকাপাকিভাবে কোলকাতায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে। এই ক'দিন আগে যখন কোলকাতা থেকে বেনাপোল যাই তখন ওই ভোররাত্তিরের ট্রেনে সঙ্গী পেয়েছিলাম হুগলীর অল্প বয়সী ছেলে আবুল ফজল আহমেদ। সে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মা-দাদা-বৌদিকে ফেলে যাচ্ছিলো চট্টগ্রামে পিসীর বাড়ি। সে দেশে উন্নতির সম্ভাবনা না দেখে দেশ ছাড়ছে। রমজান মাসের উপবাসের সময় যাচ্ছে তার পিসের কুলখানীর অনুষ্ঠানে। তারপর বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে যাবে সৌদী আরব। কোলকাতায় এ ধরনের উন্নতির সন্ধান সে পায়নি। আবুল বললো 'জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপী গরীয়সী তাই মন তো খারাপ হবেই।' কিন্তু মন খারাপকে একেবারে ভুলিয়ে দেয় সীমানায় কাসটমস ইমিগ্রেশনের অমানুষিক অত্যাচার। আবুল আর আমি বহির্গমন পর্যন্ত এক ছিলাম, তারপর দুজনে দুলাইনে দু-দেশের নাগরিক বলে। দু'দিক সেরে আবার যখন এক হলাম, আবুল জানালো 'কাকু ভারতের পাসপোর্ট বলে ভারতীয়রা অল্প টাকা নিয়েছে, বাংলাদেশীরা তিনগুন নিয়েছে।' এটাই নাকি চল। এক ভদ্রলোক জানালেন তাকে দুদিকে বারোশো টাকা দিতে হয়েছে। কোলকাতার এক সর্বজন শ্রদ্ধেয় জানালেন 'জানো সব্যসাচী, আমাদের সরকারের আমন্ত্রণে আসা বাংলাদেশী দলকে সীমানায় মাথা পিছু (ঘুষ) টাকা দিতে হয়েছে।' ঢাকার এক বন্ধু সেই একই কথা জানালেন। বললেন, 'বোধহয় চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।' আমি ১৯৯৮-এর জানুয়ারিতে কোলকাতার এক জনপ্রিয় মন্ত্রীকে এর সত্যাসত্যতা জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি অবশ্য উত্তরটা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। একজনও দেখলাম না সীমানা পারাপারের অভিজ্ঞতায় সন্তুষ্ট। সেবার ফেরার সময় পারাপার হয়েছিলাম দর্শনা গেছে সীমানা চৌকি দিয়ে। রাজনীতিবিদদের করা 'দেশভাগ'-এর অপরিণাম যে কি হতে পারে তা যদি কারো জানার ইচ্ছা থাকে তবে গেছে-দর্শনা সীমানা ভ্রমণ অবশ্য কর্তব্য। সেটা অন্য কথা। এ সব জায়গায় যারা ভিসা-পাসপোর্ট নিয়ে যাতায়াত করেন তাদের হেনস্তার শেষ নেই। পশ্চিমবাংলার গেছেতে বাংলাদেশী এক অসুস্থ হিন্দু ভদ্রলোকের পকেটে হাত দিয়ে তার শেষ যাতায়াতের টাকা নিতে দেখলাম। অথচ দর্শনায় এক বাসিন্দা জানালেন যে, তিনি 'প্রত্যেকদিন কোলকাতায় ডেইলী প্যাসেঞ্জারীতে যান দু'নম্বরী পথে। ত্রিপুরা বাংলাদেশের আখাউড়া সীমান্তে যেবার যাই সেবার যাওয়ার পথে আমি চার নম্বর যাত্রী এবং ফেরার সময় বিকেল তিনটেয় আমি এক নম্বর যাত্রী ছিলাম। বাংলাদেশ থেকে সীমানার সোজাপথ আইনী এবং দুদিকের কাঁচা পথ বেআইনী বা দুনম্বরী বা খোলা বাজারী বলা যেতে পারে। কুমিল্লা ও আগরতলা দুদিকেই ফোঁড়েরা বলেছিলো 'অনেক তাড়াতাড়ি ও অনেক সুবিধায় অনেক 'কম খরচায়' ও দিকে পৌঁছে দেবো।' আখাউড়ার এক

রাস্তায় মাছিমারা ও অন্য দুদিকে 'যানজট' দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় নি যে আমলাতন্ত্র ও খোলা বাজারের মধ্যে সাধারণ মানুষের কার ওপর বেশী ভরসা। এবারে বেনাপোলের সাদা লাইন পার হবার সময় পীযুষের কথা মনে হয়েছিল। দেশ, কাল, সময় পালটেছে। এখন রাজনীতি ও অর্থনীতির সরলীকরণের ফলে বেনাপোল-পেট্রোপোল এখন দু'দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড়োবন্দর। ইউরোপ, আফ্রিকা ও উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মতো দেশ পারাপার অতো সহজ না হলেও তিরিশ বছরে অনেক উন্নতি হয়েছে, খোলা বাজারের দু'নম্বরী বাদ দিয়েই বলছি। পারাপার আরও সহজ হবে এই আশা রাখি। আমি যাওয়ার আগে পীযুষের সহপাঠী দিলীপ বলেছিলো, 'সাচী দা পীযুষের সঙ্গে সিলেটে দেখা করবেন। ওর স্ত্রী ইন্দিরা ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেছে ওর বাবার একশ বছরের জন্ম উৎসব করতে। গেছে বেনাপোল দিয়েই। সেবারে ওর মা যখন গেলেন তখন বেনাপোল থেকে যে মাটি নিয়ে এসেছিলো তা সে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।'

ত্রিপুরা সুন্দরীর দেশে

দেশে বাঙালী একটা ভ্রমনপ্রিয় জাত বলে পরিচিত, এবং বিদেশের দেশ থেকে "দেশ-এ" গেলে কমবেশী সবাই একটু আধটু ঘোরেন। অধিকাংশ লোকই পা বাড়ান পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারত, ঢাকা বা কোলকাতায় দুদিন কাটিয়ে। খুব কম লোক পা বাড়ান পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের দর্শনীয় জায়গা দেখার জন্য, দারজিলিং বাদে। এছাড়া আরও কম লোক পা বাড়ান উত্তরপূর্ব ভারতের দিকে। আসাম, অরুণাচল, সিকিম, মণিপুর, ত্রিপুরায় অসংখ্য সুন্দর সুন্দর দেখার জায়গা আছে, তারমধ্যে ত্রিপুরা অবশ্যই অন্যতম।

ত্রিপুরা একটি অতি পুরাতন রাজ্য এবং এর কথা মহাভারতেও লিখিত আছে ঃ

"মাদ্রী সুতস্ততঃ প্রয়াদ্বি জয়ী দক্ষিনাং দিসং। ত্রৈপুবং সুবশে-কৃত্বা রাজানমমি তৌ জনম্।" (মাদ্রীসূত বিপুল যশের অধিকারী ত্রিপুরারাজাকে পরাভূত করে দক্ষিণ দিক বিজয় করেছিলেন।) চক্রবর্তীর অনেকের ধারনা এর থেকেই ত্রিপুরা কথার উৎপত্তি। আবার অনেকের ধারনা ত্রিপুরার উদয়পুরে যে হিন্দুদের ত্রিপুরেশ্বরী পীঠস্থান আছে, তাঁর নামেই রাজ্যের নাম। ত্রিপুরেশ্বরী হিন্দুদের ৫১ পীঠের অন্যতম, এবং এখানে দেবীর ডান পা পড়েছিলো। আবার অন্য অনেকে মনে করেন যে বাক্‌বরক্ ভাষার তুই "(জল)" এবং "প্রা" (নিকট বা কাছে) এবং সংমিশ্রণে ত্রিপুরা কথায় উৎপত্তি।

সে যাই হোক ত্রিপুরা যে অতি পুরাতন জায়গা তাতে কারও সন্দেহ নেই। অনেকে মনে করেন ত্রিপুরা রাজবংশ ভারতের অন্যতম দুটি পুরোনো রাজবংশের একটি (অন্যটি মনিপুরে), এবং সমগ্র পৃথিবীর অন্যতম তিন-চারটে পুরোনো রাজবংশের একটি (জাপান, ইরান, ইথিয়োপিয়া)। এছাড়া ত্রিপুরাকে অনেকে তৃতীয় বাংলা বলেও ডাকেন, কারণ প্রায় ৭৫% ভাগ লোকই ত্রিপুরায় বাঙালী বলেই পরিচিত। তবে রাজ্যের রাজ্যভাষা দুটি বাংলা এবং বাক্‌বরক্। ত্রিপুরাকে আদি বাংলা বললেও খুব একটা ভুল হবে না। ত্রিপুরায় বাংলা রাজভাষা পাঁচশ বছরেরও বেশী। সমতল বাংলায় বাংলার প্রচলন, পালযুগ বাদ দিলে, ইসলামী বাংলার আমলে। এর পরে কিন্তু বাংলা ভাষার চল থাকলেও ইংরেজ আসা পর্যন্ত রাজভাষা বরাবরই ছিলো ফার্সী। সুতরাং ত্রিপুরাকে আদি বাংলা বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

দ্রষ্টব্য জায়গাঃ ত্রিপুরার পাহাড়-বন-জঙ্গল-গ্রাম সবই দেখার মতো। তবে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে ঊনকোটি, মাতাবাড়ি (ত্রিপুরাসুন্দরী বা উদয়পুরের মন্দির), নীরমহল (মেলাঘর-এ) এবং আগরতলা।

কোলকাতা থেকে ত্রিপুরা আসলে উড়োজাহাজে আসাই প্রায় একমাত্র পথ, এবং আগরতলা ছাড়া উপায় নেই। ঢাকা থেকে আসলে হয় সোনামুড়া বর্ডার বা আগরতলা শহরের আখাউড়া

সীমানা। আসাম থেকে আসলে বাসে কাছাড় হয়ে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর হয়ে আসা যায়।

আগরতলা হচ্ছে ত্রিপুরার প্রাণকেন্দ্র। শহরটি পত্তন করেন মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মানিক্য ১৮০০ শতকের গোড়ার দিকে (১৮৩০-১৮৪০)। এমন সুন্দর নগর পরিকল্পনাবিদ দিয়ে নগরায়ন সারা ভারতে খুব কম দেখা যায়। বাংলায় যার সমতূল্য আমার চোখে পড়েনি। হয়তো কুচবিহার শহর। নাটোরের রাজবাড়ি বা পটিয়া এর কাছাকাছি, তবে সেগুলো মোটামুটি রাজধানী আগরতলায়। প্রত্যেক পাড়ার মধ্যে একটা করে দীঘি, এবং দীঘির চারপাশে রাস্তা, ও তারপরে বসতি। শহরের ছোটো রাস্তাগুলো বড়ো রাস্তায় মিশেছে। এবং দুটো বড়ো রাস্তা যেখানে মিলেছে সেখানে একটা চৌমুনী (চৌমাথা) আছে। দীঘির পাশে মন্দির, রাজপ্রসাদ, বড়ো বাড়ি ইত্যাদি দিয়ে ঘেরা। সারা আগরতলা মন্দির, মসজিদ এ ভরা। সেরা কয়েকটা জায়গার মধ্যে আছে কুজবন প্রাসাদ, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, মালঙ্গাবাস, জগন্নাথ মন্দির, বুদ্ধমন্দির, যাদুঘর, সংগ্রহশালা, বাঁশের কাজের কারখানা ইত্যাদি।

ত্রিপুরার দক্ষিণে অবস্থিত মেলাঘর-এ নীরমহল (জলমহল) ও ১৫০১ সালে নির্মিত উদয়পুরে অবস্থিত ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির (কালীমন্দির)। আগরতলার ৫৩ কি.মি. দক্ষিণে সোনামুড়ার কাছে অবস্থিত রুদ্রসাগর। ১৯২৭-৪৭ সালে রাজা বীর বিজয় কিশোর এই হ্রদ-এর মধ্যে একটি প্রাসাদ তৈরি করেন। অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদ রাজস্থানের উদয়পুরের পিচোলা হ্রদ যা পৃথিবী বিখ্যাত লেক প্যালেস-এর সঙ্গে তুলনীয়। দেশভাগ, রাজাদের আধিপত্য যাওয়ার পর থেকে এখানে কেউ বসবাস করে না। আধুনিক ত্রিপুরা সরকারের আমলে এটা একটা চড়ুইভাতির (পিকনিক) জায়গা হিসাবে আছে। এর স্থাপত্য সত্যিই দেখবার মতো। মেলাঘরের কয়েক কিলোমিটার দূরে মাতাবাড়ি তীর্থ (উদয়পুর তীর্থ অথবা ত্রিপুরেশ্বরী)। এটা ভারতের অন্যান্য তীর্থস্থানের মতোই। তবে এই উদয়পুরে আরও কয়েকটা দ্রষ্টব্য স্থান আছে। যেমন ঃ জগন্নাথ মন্দির, জগন্নাথ দীঘি, মহাদেব বাড়ি, গোবিন্দমানিক্য প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, ভুবনেশ্বরী মন্দির, মোগল মসজিদ।

এসব জায়গা আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। তবে আরও বেশী আনন্দ দিয়েছে উত্তর ত্রিপুরার ঊনকোটি বা ঊনকোটি তীর্থ। ঊনকোটির অর্থ হলো এক কোটির চেয়ে এক কম। অর্থে এখানে ঊনকোটি দেবদেবীর মূর্তি আছে। এখানে মূর্তিগুলি পাথরের পাহাড় কেটে বানানো হয়েছে ৮ম ও ৯ম শতাব্দিতে। এ কাজ আমার মহারাষ্ট্রের ইলোরার সমতুল্য মনে হয়েছে। পাহাড়-এর পর পাহাড় কেটে করা শিব, দুর্গা, কালভৈরবীর মূর্তি। আরও কতো মূর্তি ঃ বিষ্ণু, হর-গৌরী, রাবণ, নরসিংহ, গনেশ, হনুমান, আরও কত কি। ঘুরে ঘুরে দেখতে অনায়াসে এক দুদিন কাটিয়ে দেওয়া যায়।

ঊনকোটি আগরতলার প্রায় ১৭৫ কি.মি. উত্তরে, কৈলাশহর এর পাশে এবং কুমারঘাট (এখন রেল স্টেশন) শহরের ৮/১০ কি.মি. উত্তরে, এবং বাংলাদেশের শ্রীহট্ট সীমানার পাশে।

নীরমহল, উদয়পুর বা কৈলাশহর (ঊনকোটি) সবজায়গায়ই বাসে বা গাড়িতে যাওয়া যায়। ঊনকোটি তীর্থ যেহেতু পাহাড় ও ঘন বনের মধ্যে অবস্থিত সেইজন্য কুমারঘাট বা কৈলাশহর থেকে শেষপথ অবশ্যই গাড়ি নিতে হবে। নতুবা কিছুটা রিক্সায় গিয়ে শেষ কিছু পথ হাইকিং বা

পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

থাকা-খাওয়ার কথা লিখলাম না। এখন সব শহরেই হোটেল বা টুরিস্ট লজ আছে। আছে ডাবের জল ও বোতলের পরিশুদ্ধ জল। ত্রিপুরা সরকার বা বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা হোটেল বা গাড়ি ভাড়ারও ব্যবস্থা করতে পারে। ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন বিভাগ এর ঠিকানা ঃ

মন্ত্রণালয়, শ্বেত মহল, আগরতলা, ত্রিপুরা ৭৯৯০০১।

ফোন ঃ ০১১-৯১- ০৩৮১-২২-৫৯৩০ বা ৩৮৯৩।

টীকা ঃ

১. পুঞ্জপ্রসাদ চক্রবর্তী, রাজমালা ও আধুনিক ত্রিপুরা, নারায়ণ প্রেস, আগরতলা, ১৯৮৫।
২. জনসংযোগ ও পর্যটন, ত্রিপুরা। আগরতলা, ত্রিপুরা (তারিখ নেই)।
৩. সুপ্রন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরার ইতিহাস, ফার্মা কে. এল. এম., কলকাতা, ১৯৮২।
৪. স. দস্তিদার, "ত্রিপুরা সাম রিসেন্ট সোসিও-ইকনমিক চেঞ্জেস..."। সাউথ এশিয়া ফোরাম কোয়ার্টারলি, স্প্রিং ১৯৯৭, পৃ. ১৫-১৭।

❋ বিশেষ গ্রন্থপঞ্জী

শাহরিয়ার কবির, ((সম্পাদক), *জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬ঃ সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের শ্বেতপত্র*, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা; আগস্ট, ১৯৯৬

ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, (সম্পাদক), *অঞ্জলি ঃ শারদীয়া স্মরনিকা ১৩৯৯*, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি, ঢাকা; ১৩৯৯

ফজলুল বারী, *নমস্কার বাংলাদেশ*, প্রিয় প্রজন্ম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩

শাহরিয়ার কবির, *বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার চলচিত্র*, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩।

শফি আহমেদ ও পূরবী বসু, *এখনো গেল না আঁধার-সংবাদপত্রে '৯২*-এর সাম্প্রদায়িকতা, সাহিত্য সমবায়, ঢাকা, মাঘ ১৩৯৯

অরুণ সেন ও সফিদুল হক (সম্পাদক), *ধ্বসংস্তুপে আলো-বাবরি-মসজিদ-রামমন্দির বিবাদ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩।

আলী রীয়াজ, *ভয়ের সংস্কৃতি ঃ বাংলাদেশে আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের প্রকৃতি ও পরিসর*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪।

তসলিমা নাসরিন, *লজ্জা*, পার্ল পাবলিকেশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩।

রানা দাসগুপ্ত, *অব্যাহত দেশভাগ ঃ জাতীয় সমস্যা*, রীতা দাসগুপ্ত পাবলিশার্স, চট্টগ্রাম, মার্চ, ১৯৯৪।

রণজিৎ কুমার দে (সম্পাদক), *ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের দাবি ঃ অতীত প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি*, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম, অক্টোবর ১৯৯৫।

সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯২

সাপ্তাহিক বর্তমান, ৯ জানুয়ারি, ১৯৯৩

আলোকপাত, জানুয়ারি, ১৯৯৩

✹ Selected Bibliography

Abul Barkat, Shafique uz Zaman, Azizur Rahaman and Avijit Poddar, ***Impact of Vested Property Action Rural Bangladesh : An Exploratory Study***, Association for Land Reform and Development, Bangladesh; March 1996.

Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council, ***Communal Persecution And Repression in Bangladesh***, Dhaka, Bangladesh; April 1993, (Includes pictorial documentation.)

Bangladesh Hindu Buddist Christian Unity Council, ***Communal Discrimination in Bangladesh***, Dhaka, Bangladesh; May 1993, [Includes pictorial documentation.]

Congress Committee, ***Report of the General Secretaries to the 8th General conference [Special] of the North East Congress (I) Co-Ordination Committee***, Dimapur, Nagaland; June 1993.

Council for Communal Harmony, ***Documentation : Enemy (Vested) Property Act National Seminar***, Dhaka, Bangladesh; May 1994.

Cultural Survival Quarterly, Winter 1992. [Contains on Article of importance.]

Sachi G. Dastidar [Ed.], ***Bengal Studies 1994 : Essays on Economics, Society and Culture***, Old Westbury Foundation, Long Island, NY; 1996. [Contains three articles of interest.]

Glani Publication Committee, ***The Disgrace (Glani)***, Chittagong. Bangladesh; August 1992. [Some documentation of the 1990s pogrom.] [Includes pictorial documentation.]

India Today, December 31, 1992.

Taslima Nasrin, ***Lajja (Shame)***, A novella translated by Tutul Gupta, Penguin, New Delhi; 1994.

Bidyut Sarkar (Ed.], ***Bangladesh 1992 : This is Our home, Pogroms 1987-1992***, Bangladesh Minority Hindu Buddhist Christian [and Tribal] Unity Council of North America, New York; August 1993, [Includes pictorial documentation.]